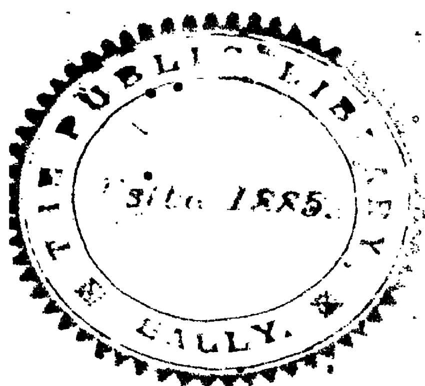
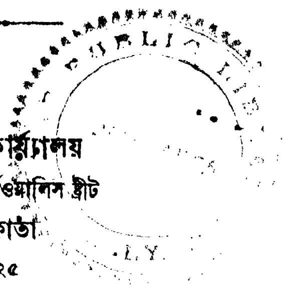

1885.

উষসী



শ্রীশান্তা দেবী



প্রবাসী কার্য্যালয়
২১০-৩-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা
১৩২৫

পাঁচসিকা

কলিকাতা ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী

পুস্তক সংখ্যা

পরিগ্রহণ সংখ্যা ৫২

সুনন্দা

মাধবপুর গ্রামের একেবারে শেষে নদীর ঠিক কোলের কাছে প্রকাণ্ড বাগানের মাঝখানে মাথা উঁচু করে যে লাল বাড়ীখানা দাঁড়িয়ে আছে, তারি চারি পাশের পাথরের নক্সাকাটা ঝোলানো বারান্দাগুলিতে প্রায়ই একটি মেয়েকে দেখা যেত। ভোর বেলা সে স্নান করে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় তার পদ্মকলির মত হাত দুখানির উপর মুখখানি রেখে প্রায়ই নদীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ত। ভোরের আলো তার অমন তুষারের মত শাদা মুখেও একটু রঙের ছোপ ধরিয়ে দিত। সেই গৌরী সুন্দরীটিকে শুধু তরুণী বল্লে ঠিক বোঝানো যায় না। বয়স তার কত বলা শক্ত। তার ভাসা-ভাসা ধূসর চোখ দুটির গভীর দৃষ্টিতে যেন শতাব্দীর দুঃখ মাখানো। গতি তার প্রৌঢ়ার মত মন্থর,

কিন্তু অতিক্ষীণ তনুলতাখানি কিশোরীর সরল সতেজ দেহ-যষ্টির মত কমনীয়। সূর্য্যোদয়ের আগে প্রথম পাখীর ডাকের সঙ্গে-সঙ্গেই তন্বী সুনন্দা যখন স্নান করে নদীর ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে ভিজে কাপড়ে ভিঝে চুলে পায়ে পায়ে জলের ছাপ ফেলে ঘাট থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত একটি জলের রেখা টেনে ধীরগতিতে কোনো দিকে না চেয়ে উঠে চলে যেত, তখন তাকে দেখে যদি কেউ কোনোদিন চিরযৌবনা জলদেবী বলে ভ্রম করত, তা হলে তাকে নেহাৎ দোষ দেওয়া যায় না। তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে জল ঝরে ঝরে পড়ত, আর চোখ দুটি দেখে মনে হত সমস্ত সাগরের জল তারি কোলে অশ্রু হয়ে টলটল করছে। মৃণালের মত তার সুগোল কোমল হাত দুখানিতে কালো চুলের রাশ শৈবালের মত জড়ানো। পাতলা ঠোঁট দুখানি রক্তের উচ্ছ্বাসে রাঙা নয়; ঝিনুকের বুকের মত স্বচ্ছ উজ্জ্বল গোলাপী। ভোরের হাল্কা হাওয়ায় তার গায়ের ধপ্ধপে শাদা কাপড়খানা সমুদ্রের বুকের শুভ্র ফেনার মত দুলে দুলে উঠত। গতি কিন্তু তার ঢেউয়ের মত চঞ্চল নয়; গভীর জলের মত

স্থির। গায়ের রং তার শাঁখের মত শাদা; রক্তের লেশ তাতে বড় দেখা যেত না। কোন্ গোপন গভীর দুঃখে এই জলদেবীটি তাঁর রহস্যময় জল-রাজ্যের বুকের ভিতর থেকে উঠে এসে নিস্তব্ধ ধরণীর এই নিরালা কোণটিতে একলা ভোরের বাতাসে তাঁর বেদনার ভার লঘু করে যেতেন তা' মানুষে দেখ্‌লে বুঝ্‌ত কি না কে জানে?

পাথরের বারান্দা-ঘেরা সেই সেকেলে-ধরণের বাড়ীখানায় প্রায় সারাদিনই তার হাসি গান শোনা যেত। সুনন্দার শরীরখানি দেখ্‌লে মনে হয় অশ্রু-সাগর মন্থন করে তোলা, কিন্তু সেই অশ্রু-সজল চোখের দৃষ্টি ছাপিয়ে তার মুখে হাসির অভাব ছিল না। তার সখী মন্দা আর মানসী তাকে অনেক সময়ই বল্‌ত—"হ্যাঁ ভাই, তোর এত হাসি আসে কোত্থেকে?" সুনন্দা বর্ষা-সন্ধ্যার সূর্য্য-কিরণের মত হাসিতে মুখ ভরে বল্‌ত, "আমার দুঃখ কর্‌বার কি আছে ভাই, যে হাস্‌ব না? ঘরও নেই, সংসারও নেই, মরে দুঃখ দিতেও কেউ নেই, মান করে চোখের জল ফেলাতেও কেউ নেই; আছে ত শুধু পর, তা' পর ত কখনও কাউকে কাঁদাতে

পারে না; তাই আমি হাসি নিয়েই আছি।” এমনি করে যখন সে জগতের লোকের সবচেয়ে বড় দুঃখটাকেই তার হাসির খোরাক বলে পরিচয় দিত, তখন তার সৃষ্টিছাড়া পাষাণ-প্রাণের পরিচয় পেয়ে সখীরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে তার হাসিভরা মুখ আর জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌ত। মানসী হয়ত মুখ ফুটে বলেই ফেল্‌ত, “সই, তোর হৃদয়টা কি পাষাণ?” সই বল্‌ত, “না, টাট্‌কা রক্ত আর কোমল মাংসের।”

মানুষের চোখের আড়ালে এলেই সুনন্দার মুখের হাসিটুকু অস্ত যেত। হাসিটা ছিল তার পোষাকী অলঙ্কার। লোকসমাজে তার অমন অলঙ্কারখানি বাদ দিয়ে যাওয়া তার পক্ষে দুষ্কর; কিন্তু নিজের একলার রাজ্যে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই বাইরের সজ্জা আপনা থেকেই খসে পড়্‌ত।

নদীর ঘাটের উপরেই ছিল শিবমন্দির। মন্দি-রের চূড়া আলো করে ভোরের বেলা সূর্য্য উঠ্‌তে যেমন কোনো দিন ভুল হত না, সন্ধ্যায় আম-বাগানের পশ্চিমে আকাশ রাঙা করে সূর্য্য অস্ত যেতেও যেমন ভুল হত না, তেমনি প্রতি সন্ধ্যায়

মন্দিরের আরতির সময় চওড়া ঢালা জরিপাড়ের ধপ্‌ধপে শাদা একখানা কাপড় পরে, জরির আঁচলখানা গলায় দিয়ে বিগ্রহের সাম্‌নে জোড় হাত করে দাঁড়াতেও সুনন্দার কখন ভুল হত না। ঘিয়ের প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো তার রক্তহীন মুখের উপর পড়ে তাকে আরো রক্তহীন দেখাত। মনে হত কে যেন সযত্নে মোম দিয়ে একটি ভক্তিমতী পূজারিণীর প্রতিমা গড়ে রেখে গেছে। মন্দিরের যে-দরজা দিয়ে শুক্লপক্ষের দিন শ্বেত-পাথরের মেজের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়ত, তারই উল্টো দিকের দরজার সামনে সেইদিকে মুখ করে সে প্রতিদিন ঠিক একটি জায়গ্যাতেই এসে দাঁড়াত। আরতির শেষে জ্যোৎস্নার আলোর মধ্যে রূপোলি জরির আঁচল গলায় দিয়ে সে যখন বিগ্রহের আসনের তলে তার ক্ষীণ গৌর তনুখানি নত করে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করত, তখন মনে হত যেন একঝাড় রজনীগন্ধা ফুল ডাল-সুদ্ধ তুষার-স্তূপের উপর নুয়ে পড়েছে। তখন তার সে শুভ্র নিষ্কলঙ্ক দেহে ধূলা লাগ্‌লেও বোধ হয় লোকের চোখে সইত না। এই পৃথিবীর ধূলিতেই যে তার জন্ম,

এই পৃথিবীর শ্মশানের কোলেই যে তার শেষ-শয্যা, তা তখন কে বল্‌বে? দেবলোকের কোনো ঋষির গলার পারিজাতমালা যেন কোন্ ক্ষ্যাপা হাওয়ার টানে এই দেবমন্দিরে খসে পড়েছে।

ঝড় বৃষ্টি, বজ্রপাত, অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার, আরতির সময় সুনন্দার কাছে সবই সমান। সেই এক বেশে এক পথে রোজ এসে সেই একটি জায়গাতে সে দাঁড়াবেই। পূজার শেষে পূজার নির্ম্মাল্যেরই মত সে নিজেকে শুচি মনে কর্‌ত। তখন আনন্দে তার ম্লান মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত। চোখের জলও উপ্‌চে পড়্‌তে চাইত, কিন্তু কাজল-কালো পক্ষ্মজালের মধ্যেই সে জল মিলিয়ে যেত। কোনো মানুষ বোধ হয় কখনও তার চোখ দিয়ে জল পড়্‌তে দেখেনি। লোকের চোখে তার অশ্রু-ধারা হাসি হয়েই দেখা দিত। চোখের সমস্ত জল সিঞ্চন করে সে এই হাসির ফসল ফলিয়েছিল।

(২)

সুনন্দার শোবার ঘরে তার শিয়রের কাছে ছোট একটি শ্বেত-পাথরের বাক্সের মধ্যে কয়েকটি জিনিষ ছিল। সব কটিই ছোটখাট জিনিষ, একটি

একটু বড় ছিল, সেটা একখানা চিঠি। চিঠিখানা কিন্তু সুনন্দার হাতেরই লেখা। সেই নিজের হাতের লিখনখানার উপরেই তার সবচেয়ে বেশী টান। সেখানা সে কাকে লিখেছিল বলা যায় না, কারণ লিপির মাথায় কোনো সম্বোধনই ছিল না। ভিতরেও তার আসল লোকটির নামের খোঁজ মেলে না। তবে চিঠিখানা যে লিখেছিল তার খোঁজ যেটুকু মেলে সেটাও নেহাৎ ফেলে দেবার মত নয়।—

—মানুষের যেটা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধন, তার ভাগ সে প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারে না। দিতে গেলেই যে কমে যাবে। তাই আমার দুঃখিনীর ধন যে দুঃখ তার ভাগও আমি আর কাউকে দিতে চাই না। আর কিছু আঁক্‌ড়ে ধর্‌বার মত, সারাজীবন যত্নে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌বার মত ত আমার নেই ; দুঃখও যদি না থাক্‌ত, আমি বাঁচ্‌তাম কার মুখ চেয়ে ? কিন্তু যেদিন আমার শেষ হবে, মনে করেছিলাম, সেদিন তোমার হাতে আমার এ এক্‌লার ধন তুলে দিয়ে যাব। এ যে একান্ত আমারই। আর কাউকে কি আমি

এর সন্ধান বলে দিতে পারি? এ ত বাইরে প্রকাশ করবার নয়। আমার দেবতা যে নিভৃতে এসে আমার বুকের মাঝখানটিতে এ অমূল্য নিধি রেখে গিয়েছেন। বাইরে ত তিনি তার কোনো চিহ্ন রেখে যান-নি। দেবতার উপর হাত চালিয়ে আমি কোন্ সাহসে জগতের কাছে তার সন্ধান বলে দেবো? কৃপণের ধন যেমন পৃথিবীর মাটির মাঝখানে কঠিন হয়ে লুকিয়ে থাকে কিন্তু উপরে তার চির-হরিৎ বসুন্ধরার ঘাসের আস্তরণ কোমল অঙ্গ মেলে থাকে, আমার এ বুকভরা কঠিন দুঃখের উপরেও তেমনি করেই আমার মুখভরা হাসি ফুটে আছে।

আমার মুখে তুমি চিরদিন হাসিই দেখে এসেছ, তাই ভয় হয় হয়ত এ কান্নার ইতিহাস তুমি বিশ্বাস করবে না।

শিশু যেদিন প্রথম পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে, সেদিন সে আনন্দের মাঝখানেই জেগে ওঠে। আমার সে প্রথম জাগরণের দিনেও কিন্তু কেউ আমাকে আনন্দে বরণ করে নেয়নি। যার কোলে আমি এসে পড়েছিলাম শুধু সেই আমায়

কোল দিয়েছিল, কিন্তু তাও চোখের জলে ভেসে। সেই মায়ের কোলই ছিল আমার সমস্ত জগৎ। ওই একটি বন্ধনই আমায় সংসারের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল। শিশুর বন্ধু জগতে অসংখ্য। রক্তের বাঁধন যাদের সঙ্গে তারা ত আছেই, আবার আনন্দের ভিতর দিয়েও বিশ্ব তার কাছে নানান রূপে ধরা দেয়। শিশু-সম্রাটের কাছে স্বেচ্ছায় দাস-খত লিখে দিতে সবাই পাগল। যাকে শিশু তার কচি আঙুলের কঠিন বাঁধনে না বাঁধে, তার দুঃখ রাখ্‌বার জায়গা থাকে না। কিন্তু সেই জন্মমুহূর্ত্ত থেকেই বিধাতা সেই শিশু আমির উপর বাম। রক্তের বাঁধন আমার কার সঙ্গে ছিল জান্‌তাম না, তবে আনন্দে আমার কাছে কোনো মানুষ ধরা দেয়নি। বিশ্ব আমার কাছে নীরব প্রকৃতির বেশেই ছিল। মানুষের প্রাণের উচ্ছ্বাস তার মধ্যে এক কণাও ছিল না।

ছেলেবেলায় আপন বলে মেনেছিলাম এমন একটিমাত্র মুখ আমার মনে পড়ে, সে আমার মায়ের মুখ। তখনকার দিনে ঘটনা ত কিছু আমার জীবনে ঘটেনি, খেলার সাথীও কেউ ছিল না যে

তার সঙ্গে কোনো স্মৃতি জড়িয়ে থাক্‌বে। তাই সবই ছায়ার মত অস্পষ্ট।

প্রথম যে ঘটনার স্মৃতি আমার মনের মধ্যে পরিষ্কার করে আঁকা আছে, সে একটা কান্নার স্মৃতি। ছবির মত মনে পড়ে আমি মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছি আর মায়ের দুই চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্‌ করে অবিশ্রাম জল পড়ে যাচ্ছে। চোখের জলে ভেজা মায়ের সুন্দর মুখখানি শিশির-ভেজা পদ্মের মত আমার চোখের উপর এখনও ভাস্‌ছে। মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন একটি বৃদ্ধ। মাথার থোকা থোকা কোঁক্‌ড়া চুল তাঁর একেবারেই শাদা। সমুদ্রের ফেনার মত সেই চুলের রাশ তাঁর শান্ত করুণ মুখখানিকে ঘিরে আছে। মা তাঁকে বল্‌লেন, "দুঃখিনীর এই মেয়েটিকে আপনাকে দিতে এসেছি। এটুকু কাছে রাখবারও আমার উপায় নেই।" তিনি হাত বাড়িয়ে আমায় কোলে নিতে গেলেন; আমি মায়ের গলা আরো জোরে চেপে জড়িয়ে ধর্‌লাম। মায়ের চোখের জল আমার মাথার উপর ঝরে ঝরে পড়তে লাগ্‌ল। জগৎ বলে আমি আমার

মাকেই জানতাম। সেই আমার জগৎ, আমার বিশ্ব যে আমায় চোখের জলে বিদায় দিতে এসেছে, তা ওই তরুণ বয়সেই আমি বুঝেছিলাম। জন্মে অবধি যে অভাগিনী মা ছাড়া আর কারো কোলে যায়নি, আজ তাকে আদর করে কেউ বুকে তুলে নিতে এলে ত তার সংশয় হবেই। তার উপর আবার মায়ের চোখে জল। আমি সেই কান্না দেখেই কান্না স্থরু করে দিলাম। খুব যে কিছু বুঝেছিলাম, তা বল্‌তে পারি না। সেই অশ্রু-নাট্যের অভিনয় যে কতক্ষণ ধরে চলেছিল, তা আজ আর ভাল করে মনে পড়ে না, কিন্তু যখন সেই করুণ কোমল পুরুষ তাঁর নিষ্ঠুর হাতে আমাকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিলেন, তখন আকাশ অন্ধকার, পথে পথিকের চলাচলও বন্ধ। অশ্রুমুখী মা আমার তখনি ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, ভয় হয়েছিল বোধ হয়, পাছে আমার লোভ এড়াতে না পেরে আবার আমার ক্ষুদ্র বাহুর ডোরে বাঁধা পড়ে যেতে হয়। সেইখান থেকেই ঘাড় ফিরিয়ে আমায় কি একটা আশীর্ব্বাদ করে মা চিরবিদায় নিলেন। সেই আমার মাকে শেষ দেখা। তাঁর পরিচয় আমি

জানি না, তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদ-বাণীও আমার মনে নেই। মনে আছে কেবল তাঁর শেষ দান যা তাঁর আশীর্ব্বাদ-রূপে বিদায়ের দিনে আমার মাথার উপর শত ধারে ঝরে পড়েছিল। বিশ্বে আমার আপনার বল্‌তে যে একজন ছিল, সেও আমায় দিয়ে গেল শুধু অশ্রুজল। তাই মাথা পেতে সেই দান নিয়েই আমি আমার জীবন-যাত্রা স্বরু কর্‌লাম। সেইদিন থেকে অল্পে অল্পে আমার হৃদয়ের গোপন কক্ষটিতে আমার এই অমূল্য সম্পত্তি সঞ্চয় করে আস্‌ছি। মূলধন আমার মায়ের দান।

বুকভরা অভিমান নিয়ে আমি জন্মেছিলাম কিন্তু অভিমান কর্‌বার লোক ত আমার কেউ ছিল না। যে ছিল সে ত শুকতারার মত ভোরের আলো ফুট্‌তে না ফুট্‌তেই মিলিয়ে গেল। দীর্ঘ দিনটা পড়ে রইল শুধু আমার জন্যে। তাই আমি আমার ভাগ্যের উপর, দুঃখের উপর, আর আমার ভাগ্যদেবতার উপরই অভিমান কর্‌লাম। ভগবান আমাকে কাঁদ্‌তেই সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর বিধানকে উল্‌টে তবে ছাড়্‌লাম। সেই যে-দিন অচেনা সেই নিষ্ঠুর হিতৈষী আমাকে মায়ের

বুক থেকে ছিনিয়ে এনে এই জগৎ-সংসারের মাঝ-খানে লোক-সমুদ্রে অসহায়ভাবে ফেলে দিলে, সে দিন থেকে আমি আর কাঁদিনি।

প্রথম কদিন সেই অজানা পুরীর একটি লোকের সঙ্গেও আমি কথা বলিনি। সেদিন রাত্রে আমার অভিভাবক আমায় যে খাটের উপর শুইয়ে রেখে গিয়েছিলেন, সেই খাট আঁক্‌ড়ে ধরেই আমি কদিন পড়ে রইলাম, নাইতে খেতেও আমি সহজে উঠ্‌তাম না। বৃদ্ধ আদর করে নিজের হাতে তুলে আমায় খাইয়ে দিতে এলেও আমি মুখ খুল্‌তাম না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট এমন জোরে চেপে ধরে থাক্‌তাম যে ঠোঁট কেটে রক্ত বেরিয়ে আস্‌ত, তবু আমার জেদ ছাড়্‌তাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃদ্ধ ভাতের থালা কোলে করে ম্লান মুখে বসেই আছেন। আমার জেদের জন্যে কত বেলা বোধ হয় তাঁর মুখেও দুটি অন্ন ওঠেনি। আমার মানভঞ্জনের জন্যে রাশি-রাশি খেলনা এসে বিছানায় জড়ো হতে লাগ্‌ল; বাগানের ফুলের গাছে একটি কুঁড়ি অবধি বাকি রইল না, সবই আমার ঘরে। তারপর ঘুসের লোভে পাড়ার যত খোকাখুকীও এসে জুট্‌তে

লাগ্‌ল। চিরকাল ওদের সঙ্গ-থেকে বঞ্চিত বলে ওদের উপরেই আমার সবচেয়ে লোভ ছিল। এত সাধ্যসাধনাতেও বৃদ্ধ আমার মুখে যে-হাসিটি ফোটাতে পারেননি, এই তরুণ মানবকদের সাহায্য নিতেই সে হাসি আপনা হতেই ফুটে উঠ্‌ল। তারপর ক্রমে এই নূতন ঘরই আমার চিরপুরাতন হয়ে উঠ্‌ল। শান্তমূর্ত্তি সেই অজানা বৃদ্ধকে আমি দাদা-মশায় বলে ডাক্‌তে সুরু করে দিলাম। নানান সম্পর্ক পাতিয়ে অতি দুঃখের মাঝখানেও একটু সুখের হাওয়া এনে ফেল্‌লাম। দাদামশায়ই আমার নাম রেখেছিলেন সুনন্দা। তার আগে কি নাম ছিল তা জানি না। আরো দুচার বছর পরে দাদা-মশায়ের কাছে আমি পূজো কর্‌তে শিখ্‌লাম। ওতেই আমার ছিল সবচেয়ে আনন্দ। দাদামশায় বলেছিলেন, ঠাকুরের কাছে সব দুঃখ নিবেদন করা যায়, সব কান্না কাঁদা যায়, সব কিছু চাওয়া যায়। মানুষকে কিছু দিতে হলে এক তিনিই পারেন; অতিবড় দুঃখও তাঁর আশীর্ব্বাদে সয়ে যায়। কথা-গুলো আমার খুব মনে ধরেছিল। রোজ সন্ধ্যায় ঠাকুরকে প্রণাম কর্‌তে গিয়ে আমি আমার মনের

সকল কথা নিঃশেষে তাঁর চরণে অঞ্জলি দিয়ে আস্‌তাম। মানুষের কাছে আমার মুখ ত অনেক দিনই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারা সবাই ছিল আমার পর; তাই আমার বাইরের জিনিষ হাসিটুকুই শুধু তাদের জন্যে রেখেছিলাম। কিন্তু আমার অন্তর জুড়ে যে কান্না ছিল, সে ত পরের কাছে কাঁদা যায় না, তাই আমার যে আপনার সেই ঠাকুরের কাছেই আমি আমার হাসির ঘোম্‌টা খুলে ফেলে নিজের আসল রূপে দেখা দিতাম। দাদামশায়ের ঘরে আমার আদরের অভাব ছিল না, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার যে একটা বিশেষ প্রভেদ ছিল, সেটা আমি সেখানেও অনুক্ষণ পদেপদে অনুভব করতাম। তিনি আমায় নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মাঘের রাত্রেও যদি কোনো দিন খাওয়ার কি পূজার আগে আমায় ছুঁতে হয়েছে, তা হলেই স্নান না করে নিস্তার নেই। আমি পাছে মনে এতটুকু ব্যথা পাই, কি সামান্য কিছু সন্দেহ করি, তাই আমার সম্বন্ধে সমস্ত আচার-বিচারে দাদামশায় আমাকে খুব লুকিয়ে চল্‌তেন। কিন্তু আনন্দ যার চোখের পর্দ্দা হয়ে আড়াল করে নেই,

তার চোখ এড়াবে কার সাধ্য? দাদামশায় ধরা পড়ে গেলে মুখ তাঁর শুকিয়ে এতটুকু হয়ে যেত, চোরের মত পালিয়ে বেড়াতেন পাছে আমি তাঁর এ ভীষণ অপরাধের কোনো কৈফিয়ৎ চেয়ে বসি। কিন্তু তিনি জানতেন না যে আমার ঠাকুর লোকের কাছে চাইবার কি বলবার জন্যে আমার আর কিছু রাখেননি। আমার যা কিছু নালিশ সব সেই এক-জনেরই চরণে। আসামী দাদামশায়কে আমিই এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে মুক্তি দিতাম। তাঁর কিন্তু আমার দিকে চোখ তুলে চাইতে অনেক দেরি হত। পাড়ার লোকে অনেক সময় এসে দেখ্‌ত আমি দাদামশায়ের তুষার-শুভ্র চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে কত রকম হাসি গল্প কর্‌ছি। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কেউ কেউ প্রশ্ন কর্‌ত, "ঠাকুর, উমা মা কি আপনার ঘরে এসে বাঁধা পড়ে গেছেন?" কথা শুনে দাদামশায়ের মুখ শাদা হয়ে যেত, তিনি আমার কি যে পরিচয় দেবেন ভেবে কূল পেতেন না। আমি হেসে বল্‌তাম, "আমি দাদামশায়ের কুড়োনো নাত্‌নী, উমাও না, রমাও না।" দাদামশায়

ক্ষীণ হাসি হেসে ঘাড় নাড়তেন, মুখ দিয়ে কথা বেরোত না।

বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে দাদামশায়ের ক্ষীণ দেহ আরো ক্ষীণ হয়ে উঠতে লাগল। একদিন মাঘের শেষে শুনলাম, এখানে থাকা আর আমাদের চলবে না। শেষ বয়সে দাদামশায় মাধবপুরে দেশের মাটিতে মাথা রেখে বিশ্রাম নিতে চান। মাধবপুরের আমবাগানে বসন্তের দূত আম্রমঞ্জরীর আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে বাগানের মাঝখানের লাল-বাড়ীখানাতে আমাদেরও উদিত হতে হল। শ্মশানপুরীর মত শূন্য সেই নির্জ্জন বাড়ীর চারধারে লোকজনের চিহ্নও পাওয়া যায় না। শুনেছি এককালে ঐ বাড়ীতেই লোক ধরত না। উৎসবে আনন্দে সারা বছরের মধ্যে বাড়ীখানা একদিন বিশ্রাম পেত কি না সন্দেহ। অন্দর-মহল, বৈঠক-খানা, নাটমন্দির, দেবালয়, কিছুরই অভাব নেই; কিন্তু সবই এখন শূন্য। আছে কেবল দেবালয়ের নিত্য পূজার পাট। লক্ষ্মী যেদিন সামান্য কোন্ অছিলায় দাদামশায়ের প্রতি প্রথম বাম হন, সেদিন থেকে একে-একে সবাই তাঁর প্রতি বাম হতে

সুরু করলে। শুনেছি ষষ্ঠীর কৃপা তাঁর উপর অফুরন্ত ছিল, কিন্তু শেষকালে একটি মাত্র পৌত্র না দৌহিত্রতে গিয়ে ঠেক্‌ল। তার মায়াও কাটাবেন বলেই তিনি দেশের ঘরবাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মরণ যখন ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর বংশের শ্মশান তাঁকেও নিজের কোলে ডাক দিলে। দাদামশায় বাড়ী ফের্‌বার দিনে বল্‌লেন, "যে মাটিতে একে-একে বুকের সব ক'খানি হাড় বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছি, এ ভাঙা পিঁজ্‌রাখানা আর তার কাছ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে কি সুখ পাব? যাই, তবু তাদের শ্মশানে মরেও যদি জুড়োতে পারি।" যে মরণের লোভে এখানে এসেছিলেন, সে মরণ ত আস্‌তে ভোলেনি, কিন্তু হাড় তাঁর জুড়িয়েছে কি না কে জানে!

এই শ্মশানপুরীর সেই প্রদীপ তোমায় যেদিন প্রথম দেখি, সে অনেক দিনের কথা। তোমার কি মনে আছে? তোমাদের বাড়ীর ঘাট যখন বাঁধানো হয়েছিল, তখন বোধ হয় নদীর গতি অন্য-রকম ছিল। তার পর কতকাল গেছে, নদীর মুখ ফিরে গেছে, কিন্তু পাথরে-বাঁধা ঘাট সেই তার

চির-পুরাতন কোণটিতেই অচল হয়ে আছে। জল সরে যাওয়াতে ঘাটের শেষ সিঁড়ির পরেও অনেকখানি পায়েহাঁটা পথ সাপের মত এঁকে-বেঁকে নদীর ভিতর গিয়ে পড়েছে। তার উপরে ত্রিভঙ্গ হয়ে একটা বড় বটগাছ নদীর উপর ঝুঁকে পড়ে কালো জলের বুকে কতকাল ধরে নিজের ছায়াই দেখে আস্‌ছে। নদী আদর করে তার পা ধুইয়ে ধুইয়ে সমস্ত ধূলামাটি নিজের অঙ্গে তুলে নিয়ে শুধু অসংখ্য-শিকড়ে-বোনা হাড়-পাঁজরের মত কাঠামোখানা রেখেছে। আদরের ঘটা বেশী বাড়্‌লে হয়ত তাকে একদিন সশরীরেই নদীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে হবে। এই বটগাছের তলায় দুখানা বড় পাথর জোড়া দিয়ে এখনকার ঘাট। সেদিন খুব ভোরে, নদীর জল তখনও উষার আলোয় রাঙা হয়ে ওঠেনি, ধূসর অঙ্গ মেলে দিয়ে তরুণ অরুণের প্রথম চুম্বনে সিঁদুর হয়ে ওঠ্‌বার অপেক্ষা কর্‌ছে; আমবাগানে দোয়েল পাপিয়া সেই সবে সূর্য্যদেবকে ডাকাডাকি সুরু করেছে; এমন সময় আমি ঘর ছেড়ে নদীর ঘাটের সেই পাথরের উপর গিয়ে বসেছিলাম। ভাব্‌ছিলাম আমার

ভাগ্যের কথা ; ত্রিকুলে কেউ আছে কি না জানি না বলেই কপালগুণে যার ঘরে এসে পড়েছি, তারও ঘরে দুর্দিন 'পরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালাবার লোক জুট্‌বে কি না বলা ভার। হাত দিয়ে নদীর জল কাট্‌তে কাট্‌তে এমনি কত কি ভাব্‌ছিলাম, পায়ের শব্দে চোখ তুলে হঠাৎ চাইতেই দেখি তরুণ ব্রহ্মচারীর মত দীপ্তমূর্ত্তি তুমি সেই পায়ে-হাঁটা পথে নদীর দিকে এগিয়ে আস্‌ছ। উষার আলো চোখে পড়্‌বার আগেই তোমার সঙ্গে সেই আমার প্রথম শুভদৃষ্টি। জানি না সে কি অশুভক্ষণে ঘটেছিল !

তার প'র যখন জান্‌লাম, এ বাড়ীতে নবীন আর প্রবীণ বল্‌তে তুমি আর দাদামশায় এই দুটিমাত্র আমার পাবার মত সঙ্গী, তখন প্রবীণকে বাদ দিয়ে আমি তোমাকেই বেছে নিলাম, তুমিও আমাকেই বেছে নিলে। তোমার সঙ্গ পেয়ে আমার চিরদিনের বাইরের হাসি ক'দিনের জন্যে অন্তরের হয়ে উঠে আমার ভিতর-বাহির আলোয় আলো করে দিলে। সে কদিনের জন্যে আমার সব দুঃখ আমি বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম ; মনের কোনো কোণে এতটুকু দুঃখও মুখ আঁধার করে ছিল না। ঘাটে, পথে, মাঠে

একবার টেরও পেলাম না। এখন শুধু মনে হয়, কোন্ সুদূর অতীতে স্বপ্নের ঘোরে তারা দেখা দিয়েছিল, আবার চোখ না মেল্‌তেই সোনার পাখা মেলে নিঃশব্দে কখন আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেছে। স্মৃতি হয়ে পড়ে আছে শুধু তাদের ডানাখসা একটি পালক।

আমি চোখ বুজে আমার এতদিনের দুঃখের শোধ বোধহয় সেই কদিনেই তুলে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু অত মূর্চ্ছনা সে সোনার তারে সইবে কেন? তার একদিন ছিঁড়ে গেল, আমার আনন্দ-গানও সেই থেকে থেমে গেছে।

আমাদের ছেলে-খেলার দিনগুলো হাসি আর গানে যখন ভরপূর হয়ে উঠেছে, তখন ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীটার এক কোণে দাদামশায় তাঁর শেষ শয্যায়। সারাদিনটাই নিজের আনন্দ নিয়ে কাটিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় আমি রোজ দুবার তাঁর ঘরে খোঁজ নিতে যেতাম। আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে দাদামশায়ের শান্ত দৃষ্টি কেমন যেন করুণ হয়ে আস্‌ত, তিনি তাঁর দুর্ব্বল হাতখানি তুলে আমার মুখে চোখে মাথায় এমন স্নেহভরে বুলিয়ে দিতেন,

যেন আমার দেহের সমস্ত গ্লানি তাঁর হাতের স্পর্শে দূর হয়ে যাবে। আমি জান্‌তাম, পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার দিনে পরপারের কথার চেয়ে তিনি তাঁর আশ্রিতা দুঃখিনীর কথাই বেশী ভাবেন। এই বয়সে দরিদ্রার এই অসহায় অনাথা মেয়েটিকে কার কাছে ফেলে যাবেন, সেই ভাবনাতেই তাঁর আয়ু যেন আরো শীঘ্র শেষ হয়ে আস্‌ছিল। আমি জান্‌তাম, আমার নীচকুলে জন্ম, দাদামশায়ের মত উদার মহৎ পুরুষও যখন খাবার আগে আমায় ছুঁলে স্নান করতেন, তখন আর-কোনো ভদ্রলোক ত আমায় ঘরে ঠাঁইও দেবে না। কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলনের সে কটা দিন আমার ওসব কথা ভাব্‌বারও অবসর ছিল না। দাদামশায় কত সময় আমাকে কাছে টেনে বসিয়ে কি যেন একটা কথা বল্‌বার ব্যর্থ প্রয়াস করতেন, তাঁর চোখে সে কথা প্রায় ফুটে উঠ্‌ত, আমার কাছে—তাঁর এই আশ্রিতার কাছেই তাঁর যেন কি একটা নিবেদন আছে মনে হত, কিন্তু আমার তখন সে বৃদ্ধের চোখের কান্নার ভাষা পড়্‌বার সময়ও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না; তোমার তরুণ চোখে যে নিত্য

নূতন ভাষা শতদল-পদ্মের মত হাজার কথা ফুটিয়ে তুলত, আমার সমস্ত মন তখন সেই দিকে। হেসে দুটো কথা বলে, মাথার বালিশ কটা গুছিয়ে দিয়ে, বিছানার চাদরটা একটু ঝেড়ে দিয়ে, আমি যখন ক্ষিপ্রগতিতে কত ঘর বারান্দা পার হয়ে নিজের মনে চলে যেতাম, তখন আমার পিছনে যে কত দীর্ঘশ্বাস শূন্যে মিলিয়ে যেত, তার ঠিকানা নেই। আজ চোখে না দেখেও সে সমস্তই আমার চোখে পরিষ্কার ভেসে উঠ্‌ছে, কিন্তু সেদিন চোখে আঙুল দিলেও চেয়ে দেখ্‌তাম না বোধ হয়।

সেই যে একদিন পদ্মবনের ধারে ঘাসের উপর বসে তোমাতে আমাতে প্রকাণ্ড পদ্মফুলের মালা গেঁথেছিলাম, সেদিনকার কথা তোমার মনে আছে কি? একই সুতোর দুই মুখ দিয়ে দুজনে ফুল পরিয়ে পরিয়ে মালাটা বড় করে তুল্‌ছিলাম; পাছে দুজনের ফুল মিশে যায় বলে মাঝখানে একটা বড় ফোটাফুল দুলিয়ে দিয়েছিলাম। দাদামশায় পদ্ম-ফুল বড় ভালবাসতেন, তাই আমি মালাটা নিয়ে তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি মুখ ফিরিয়ে শুয়ে ছিলেন। আমি ডেকে বল্‌লাম, "দেখ

দাদামশায়, কত বড় মালা, এই দেখ, পর্‌লে আমার পা পর্য্যন্ত পড়ে।"

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, "পদ্মের আড়ালে যে লুকিয়ে গেলিরে! একেবারে দেবী সরস্বতী! এত ফুল কে দিলে?"

"তোমার নাতি শঙ্করপ্রসাদ।"

মনে হল দাদামশায়ের রক্তহীন মুখ যেন আরো একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। তবু তিনি হেসে বল্‌লেন, "সুনন্দা দিদি, তোমরা যে হেসে খেলেই দিনগুলো শেষ কর্‌লে দেখ্‌ছি। তা প্রতিদিনই সকাল সন্ধ্যে এত হাসি খেলা কি ভাল? এর পর, বড় হচ্ছ, আরো কত ভাবনা চিন্তা আছে, সুখ দুঃখ আছে, সেদিকেও ত চাইতে হবে? পৃথিবীটা ত শুধু হাসি দিয়ে গড়া নয়; কাঁদ্‌বার জিনিসেরও সেখানে অভাব নেই। হেসেই যদি দিন কাটে, তবে কান্নার দিনে দুঃখ বড় কঠিনরূপে দেখা দেবে। বেদনার সে আঘাত সইতে পার্‌বে কি না বলা শক্ত। তা' দিদি তোমায় দেখে কথাগুলো মনে হল তাই বল্‌লাম। ঠাকুর করুন, তোমার যেন দুঃখের দিন না আসে। তবু প্রস্তুত হওয়া ভাল।"

আমি ফুলের মালাটা দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে চলে এলাম। বুঝ্লাম আমাদের প্রতি-অঙ্গই তাঁর কাছে আমাদের আনন্দ-উৎসবের কথা জানিয়ে দিয়েছে। তাঁর কোণের ঘরটিতেও আমাদের হাসির ঢেউ বাতাসের সঙ্গে ভেসে গিয়েছে। কিন্তু সে হাসি আনন্দ তাঁকে সুখ দেয়নি, বেদনাই দিয়েছে। তাঁর হৃদয়ের কোনো গোপন দুঃখ আমাদের হাসির ঘায়ে আবার জেগে উঠেছে। আমিই কি সে দুঃখের কারণ ?

সেদিন আর কারুর সঙ্গে কথা কইনি। নদীর ধারের পাথরের বারান্দায় একলাটি মুখ আঁধার করে বসে রইলাম। কেবলি মনে হচ্ছিল, কি একটা কঠিন দুঃখের অগ্রদূত আজ দেখা দিয়েছে। আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্ছিল। কি সে দুঃখ, যা আমার মাথার উপর উদ্যত হয়ে আছে ? কিসের জন্যে প্রস্তুত হব ? একবার মনে হল তুমি বুঝি আমার নামে কোনো কথা দাদামশায়ের কাছে বলেছ। কিন্তু ভেবে দেখ্লাম, আমি ত কখনো তোমার কাছে কোনো অপরাধ করিনি। তবে কি ? দাদামশায়ের কাছেও ত কোনো দোষ

হয়নি। তবে বুঝি আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে! সেই খবরটা আমাকে দেবার জন্যে দাদামশায় অত করে আমায় প্রস্তুত করছিলেন। সেই কোন্ শিশুকালে মাকে দেখেছি, মায়ের সেই অশ্রুসজল মুখ মনে পড়্ল, কিন্তু আজ ত সেই সে দিনের মত দুই চোখ বেয়ে জল নেমে এল না। আমার আর আপনার বল্‌তে কেউ নেই মনে করে দুঃখ হল বটে, কিন্তু সেটা আগে ভেবে-চিন্তে দেখ্‌বার পর। যে-দিন চোখের জলে মাকে বিদায় দিয়েছিলাম, সে-দিনকার কথা মনে পড়্ল। মা ত আমাকে লোককে দিয়ে দিয়েছে, সে মায়ের জন্যে কাঁদ্‌তে যাব কেন? কেন, গরীবের ঘরে কি আমার এক মুঠো অন্নও জুট্‌ত না? যার যা খুসী হোক, আমি কিছুতেই কাঁদ্‌ব না। শক্ত হয়ে বসে আমি দাদামশায়ের ভয়-দেখানো কথাগুলো মন থেকে দূর করে দিলাম।

তার পরদিন থেকেই আমাদের অজস্র আনন্দের স্রোতে মন্দা পড়ে গেল। আমিই সব-তাতে গা-ঢিলে দিতে সুরু কর্‌লাম। যেন এককোণে বসে আপন মনে কাজকর্ম্ম করাই আমার চিরদিনের

অভ্যাস, এম্‌নি ভাবে খুঁটিনাটি যা' তা' নিয়ে সারা দিন কাটিয়ে দিতাম। তুমি আমার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে ফিরে যেতে; কখনো যদি বা কিছু বল্‌তে, আমি এক মুখ হেসেই উত্তর দিতাম; কিন্তু আগের মত তেমন সহজ আনন্দের উচ্ছ্বাস আর রইল না।

কদিন ধরে আমার ব্যবহার লক্ষ্য করে যেদিন সকাল-বেলা তুমি গিয়ে সারা সকালটাই দাদামশায়ের ঘরে কাটিয়ে এলে, সে-দিন তুমিই বা তাঁকে কি বলেছিলে আর তিনিই বা তোমাকে কি বলেছিলেন, তা' আমি জানি না: কিন্তু সারাদিন বাড়ীতে বই হাতে করে বসে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা যেই তুমি বেরিয়ে গেলে অম্‌নি দাদামশায়ের ঘরে আমার ডাক পড়ল। দাদামশায় বল্‌লেন, "দিদি সুনন্দা, আমার ত দিন ফুরোলো। এখন যাবার আগে তোমার আর শঙ্করের কাছে আমার যা' বল্‌বার আছে, তা' বলে যেতে হবে ত। তাই দিন থাক্‌তে আজই তোমায় ডাক্‌লাম। তাকে যা বল্‌বার আমি বলে নিয়েছি। আর সে পুরুষমানুষ, তার জন্যে আমার ভাবনা কি? বিয়ে করে ঘর

সংসার পাত্‌বে, যেমন করে হোক দিনগুলো কেটে যাবে। তোমার জন্যেই যা ভাবনা।” দাদামশায় আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমার বিয়ের কথা আগে কোনো দিন ভেবে দেখিনি, প্রথম কথাটা শুনে আমার মুখ শুকিয়ে গেল ; আমি মুখটা নীচু করে পাশ ফিরে বস্‌লাম। দাদামশায়ের চোখের দিকে তাকাতে পার্‌লাম না।

তিনি আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন, “দেখ দিদি, তোমায় আমি যে কতখানি ভালবাসি তা’ তুমি বুঝ্‌বে না। আমার শঙ্করের চেয়ে কম হবে না। যে-দিন এ ঘর-দোর শ্মশান করে দিয়ে ছেড়ে চলে গেলাম, সেদিন মনে করেছিলাম যে-কটা দিন আছি ভাল আর কাউকে বাস্‌ছি না। ওর মত দুঃখ জগতে আর কিছুতে দেয় না। কিন্তু তোর মুখখানা দেখে আমার সব প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল। ভগবান শূন্য মন ফেলে রাখেন না ; কাউকে না কাউকে তার মাঝখানে আসন দেনই। তাই সেদিন থেকে আমার বুক জুড়ে তোর মুখখানা জেগে রইল। শঙ্কর মামাবাড়ী ছিল, তাকে আমি ইচ্ছে করেই কাছে নিইনি ; কিন্তু ফাঁকি দিয়ে যাব কোথায় ?

দিনগুলো যে কেমন করে কেটে গেল, তা আমি তুই এসে তার ঠাঁই জুড়ে বস্‌লি। সেদিন থেকে প্রাণ দিয়ে কেমন করে তোকে হাতে করে গড়ে তুলেছি, কত দুঃখ পেয়েও তোকে ছাড়িনি, তা ত তুই জানিস দিদি। দুঃখের একটি আঁচড় তোর গায়ে লাগ্‌তে দিইনি, পাপের ধূলিকণাও পায়ে ঠেক্‌তে দিইনি। বুক দিয়ে সব থেকে তোকে আমি বাঁচিয়ে এনেছি। কিন্তু হলে কি হয় দিদি, আজ যাবার আগে অতি কঠিন আঘাত আমাকেই তোর প্রাণে দিতে হবে। নইলে যে উপায় নেই। আর কোনো পথ ভেবে পেলাম না। এতদিন যে বোঝা আমি বয়েছি, আজ তোর কোমল অঙ্গে তার ভার তুলে দিতে হবে।” দাদামশায়ের কথা শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে যাচ্ছিল। আমি একবারও না নড়ে নিঃঝুম হয়ে সেইখানেই বসে রইলাম।

তার পর যা শুন্‌লাম, সে বড় কঠিন কথা। শুন্‌লাম আমার অজানা পাপের ইতিহাস। পাপ কাকে বলে তা আমি জান্‌তাম না; কিন্তু শুন্‌লাম আমার শরীরের প্রতিবিন্দু রক্তেই পাপ। বুঝ্‌লাম,

অন্নের অভাবে আমি এঘরে আসিনি, মায়ের সঙ্গের হাত থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্যেই মা আমাকে নিজের হাতে বিসর্জ্জন দিয়েছেন। দাদামশায়ের পুণ্যের জোরে যদি আমার পাপটা ধুয়ে যায় তাই আমাকে সঁপে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাপ ত যায়নি। আমি যে জন্মদাগী, আমার দাগ মিলোবে কি করে? কয়লার কালি কি ধুলে যায়?

দাদামশায় বল্লেন, "দেখ্ দিদি, তোকে আমি বড় ভালবাসি। কিন্তু মানুষের মাটির শরীর কিনা; একটু ছোঁয়া লাগ্লেই কালী লেগে যায়। তাই তোকে ব্যথা দিয়েও আমি তোর ধরা-ছোঁওয়ার আচার-বিচার করেছি। তোর কাছে ধরা পড়্বার ভয়ে আমি চোরের মত পালিয়ে বেড়িয়েছি। আজ যাবার সময় ঘনিয়ে এল; আজ আর আমার লুকিয়ে রাখা সাজে না; তাই সব বলে যাচ্ছি। যে বুড়ো মরণকাল অবধি তোকে আগ্লে এল, তার একটি অনুরোধ রাখিস্, দিদি। তোর নিজের চোখে এখনো যা ধরা পড়েনি, আমার চোখে অনেক দিনই তা' ধরা পড়েছে। আমার শঙ্কর যে দিনে দিনে তোকেই তার চোখের মণি করে তুল্ছে তা আমি

দেখেছি, আজ সকালে তার প্রমাণও পেয়েছি। সুনন্দা, আমি জানি তোর মনে কোথাও একটু পাপ নেই, গঙ্গাজলের মত তুই নির্ম্মল। কিন্তু মানুষের সমাজে তাতে যে কিছু হয় না ভাই। মানুষ তার মাটির শরীর নিয়ে বড় ভয়ে ভয়ে বাঁচিয়ে চলে। তাই বল্‌ছি দিদি, আমার এই একমাথা পাকা চুল ছুঁয়ে তুই বল্, আমার আঁধার ঘরের শেষ রশ্মি শঙ্করকে তুই সমাজের চোখে সমাজের মানুষ হয়েই চল্‌তে দিবি। তুই যদি কঠোর হোস্ তবে তার পুরুষের মন একদিন তোকে ভুল্‌বেই ভুল্‌বে। আমার এ ঘর বাড়ী কিছু আমি শঙ্করকে দিয়ে যাব না। সমস্ত তোরই নামে লিখে দিয়েছি। নইলে তুই দাঁড়াবি কোথায় ?”

ঘরবাড়ীর কথায় আমার গায়ে যেন কে বিছুটি দিয়ে গেল। তবু কথা কইলাম না ; তাঁরই কথামত মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম। কিন্তু যখন কর্‌লাম তখন বুঝ্‌লাম কতখানি করেছি। আগে একদিনও বুঝিনি।

তিনি আরো বল্‌লেন, “দিদি, আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি

আর-জন্মে তুমি সাবিত্রী হয়ে জন্মো ; তোমার এজন্মের তপস্যায় জন্মজন্মান্তরের সমস্ত কালী ধুয়ে যাবে। এজন্মে দেবতা রইলেন তোমার স্বামী, পৃথিবীর পাপ তাঁকে স্পর্শ করে না। সতীলক্ষ্মী হয়ে তাঁর সেবা কোরো। তাঁর চরণপ্রসাদে জন্মান্তরে তুমি তোমার তপস্যার ফল পাবে।”

কঠিন প্রতিজ্ঞা করে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। সেই দিন থেকে শঙ্করের জন্য আমার তপস্যার সুরু। এতদিন ছিলাম বালিকা ; সেদিন হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে নারীর প্রাণ জেগে উঠ্‌ল। বুঝ্‌লাম, না জেনে দিলেও তোমাকেই সব দিয়ে ফেলেছি। সকল-লজ্জা-নিবারণ যিনি তিনিই আমার মুখ রেখেছেন ; তাই এ দানের কথা তুমিও জাননি, আমিও জানিনি। তোমায় ভাল বেসেছি বলেই আজ তোমায় ভুল্‌তে হবে। কিন্তু মানুষের মন যেটা ভুল্‌তে চায় সেইটেই যে তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসে। এতদিন যা ছিলে না, তোমার পথ মাড়াব না প্রতিজ্ঞা কর্‌তেই তুমি আমার তাও হয়ে বস্‌লে। সোজা পথে ত মানুষের মন চলে না, অসম্ভবের আশাই তাকে টেনে নিয়ে চলে।

তারপর অল্পে অল্পে আমি তোমার পথ থেকে সর্‌তে সুরু কর্‌লাম। হঠাৎ সর্‌লাম না, পাছে তুমি টের পাও। এম্‌নি ভাবেই সরতে লাগ্‌লাম, যেন বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেখেলার সাধটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। তোমার উপর যে আমার একটা টান ছিল, সেটা আমি নিজের কাছেও অস্বীকার কর্‌তে সুরু করে দিলাম ; যেন খেলারই আনন্দে তোমায় শুধু সঙ্গী নিয়েছিলাম।

আগে তোমার সঙ্গে আমি কখনও বিয়ের কথা বলিনি, আজকাল অহরহ তোমায় বউয়ের কথা বলে ক্ষ্যাপাতে সুরু করে দিলাম। তুমি রাগ কর্‌তে, আমি আমার উপর তোমার রাগটা বাড়িয়ে তোল্‌বার জন্যে আরো বল্‌তে থাক্‌তাম। ভাব্‌তাম তুমি আমারই উপর রাগ করেছ। কিন্তু এখন বুঝেছি আমার উপর নয়। সেই পৌষ সংক্রান্তির দিনে তুমি বোধ হয় আমায় কি বল্‌বে বলে এসেছিলে। তোমার হাতে একছড়া ফুলের মালা ছিল। হাসি-মুখে সেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে তুমি কি বল্‌তে যাবে, অম্‌নি আমি বলে উঠ্‌লাম, "আচ্ছা বোকা যাহোক তুমি, এখন থেকে পরের জন্যে বেগার

খেটে মর কেন? যখন একজন আস্‌বে তখন ফুলের মালা জুগিও। বেনা বনে শুধু শুধু মুক্তো ছড়াও কেন?”

তুমি নীরবে ব্যথাভরা চোখ তুলে আমার দিকে চাইলে। তোমার দৃষ্টি যেন বলে গেল, “সুনন্দা, তোমার মুখে এমন কথা!” আমি যেন কিছুই বুঝিনি এম্‌নি ভাবে নেহাৎ খাপছাড়া-রকমের কি একটা পিঠের গল্প জুড়ে দিলাম। কিন্তু তোমায় ঘা দিতে আমার বুকে যে কতখানি লাগ্‌ত তা ত তুমি বুঝ্‌তে না। তুমি মনে কর্‌তে আমার পাষাণ-হৃদয়ে কোথাও এক ফোঁটা কোমলতা নেই। কিন্তু সেই পাষাণ ভেদ করেই আমার হৃদয়ে সহস্রধারা ঝরে পড়্‌ত।

সেদিন তোমার কথা বলা হল না। ম্লান মুখে তুমি চলে গেলে। আমি তোমায় শুনিয়ে শুনিয়ে খুব হাসির লহর তুলে ও-পাড়ার মন্দাকে রাজ্যের হাসির খবর দিতে বস্‌লাম। মন্দা শুনেছিল কি না জানি না, কিন্তু তুমি যে শুনেছিলে তা’ জানি।

তোমায় ভাল বেসেছিলাম বলেই তোমাকে

আমি অত করে ঘা দিতে চেষ্টা কর্‌তাম, আমায় নিষ্ঠুর বলে বুঝ্‌লেই যে তোমার মঙ্গল। তোমারি মঙ্গলের জন্যে আমি সাধ করে তোমার কাছে খোস্-নাম হারাতে চাইতাম। নইলে আমার কিসের গরজ।

যে অপমানের বোঝা নিয়ে আমি জন্মেছিলাম, সে অপমান ধ্রুব হয়ে আমায় ঘিরেই থাকুক ; আর কাউকে সে বোঝা মাথায় নিয়ে মাথা হেঁট কর্‌তে দেবো না। আর তোমায় ত আমি তার এককণা স্পর্শ কর্‌তেও দিতে পার্‌ব না। তাই এ অপমানিতার কাছ থেকে দূরে রাখ্‌বার জন্যই তোমায় আমি অত করে ঘা দিতাম। তোমার নিষ্কলঙ্ক কপালে কলঙ্কের ছাপ দিতে আমি প্রাণ থাক্‌তে পার্‌ব না। আমার ভয় হত যদি একবার তোমার কাছে আমার মনের কথাটি ধরা পড়ে যায়, যদি তুমি জান্‌তে পার, তোমাকে আমি কতখানি দিয়ে ফেলেছি, তবে হয়ত শত অপমানের বোঝা মাথায় করেও তুমি আমায় তোমার চিরসঙ্গী করে নেবে। কিন্তু আমি তা হতে দেবো না। সকল ধর্ম্ম যাকে ছেড়ে দিয়েছে, যাকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়েছে, তোমার সহধর্ম্মিণী হবে সে কিসের স্পর্দ্ধায় ?

একবার মনে করেছিলাম, তোমার কথাগুলো শুনে, আমারও যা বল্‌বার আছে বলে নি। আমি যে কিসের দায়ে ঠেকে তোমাকেও বেদনা দিতে পেরেছি তা' জানিয়ে দি। কিন্তু মনে হল আমি যদি তোমাকে এ দুঃখের ভার দি, তবে তোমার দুঃখই বাড়্‌বে; দুঃখ ভোল্‌বার পথ আর হবে না। তাই ভেবেছিলাম, আপনি বিরূপ হয়ে তোমাকেও বিরূপ কর্‌ব। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আমিই ভুল বুঝেছিলাম। এর চেয়ে সে দুঃখ ছিল ভাল।

পূজোর সময় সেবার যখন পদ্মবনের ধারে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, তখনই তোমার চোখে আমাদের সেই পুরানো স্মৃতির কথা ভেসে উঠ্‌ল। তুমি ভেবেছিলে আমিও তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই সে সব কথা বুঝে ফেল্‌ব। কিন্তু আমি একেবারে নূতন মানুষের মতন বল্‌লাম, "এখানে ত দেখি এবার খুব পদ্মফুল ফুটেছে!"

তুমি বল্‌লে, "কেন, সেই যেবার তুমি আর আমি একসঙ্গে একটা মালা গেঁথেছিলাম সেবার কি কিছু কম ফুটেছিল?"

আমি বল্‌লাম, "ওঃ সে কবে ছেলেবেলায় কি হয়েছিল, আমার মনেও পড়ে না।"

তুমি বল্‌লে, "সে কি, সুনন্দা, এখনো যে বছর ঘোরেনি, এর মধ্যে ভুলে গেলে ?"

আমি একটু হেসে বল্‌লাম, "তা হবে হয়ত, আমার অত খুঁটিনাটি মনে থাকে না।"

তুমি দুঃখিত হয়ে বল্‌লে, "আমার ওর চেয়েও ঢের খুঁটিনাটি মনে আছে।"

আমি ভালমানুষ সেজে বল্‌লাম, "আমার ভাই, স্মৃতিশক্তিটা দিন-দিনই যেন কোথায় যাচ্ছে, এর পর তোমার কাছে মনে-রাখা শিখ্‌তে হবে।"

আজ যদি সাক্ষ্য দিতে পার্‌তাম, তবে কিন্তু দেখিয়ে দিতাম খুঁটিনাটি মনে রাখায় আমি তোমার কত উপরে। মুখে অমন অনেক কথা বল্‌লেও, বাইরে তোমায় একেবারে এড়িয়ে চল্‌লেও, তোমার সকল কাজ, সকল অভ্যাস, চলা ফেরা, কথা বলা, সব আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, আমার সমস্ত দেহমনে তার সাড়া বাজ্‌ত। তোমাকে ভুল বোঝাবার জন্যে আমি তোমার চলাফেরা দেখেও দেখ্‌তাম না ; কিন্তু তোমার সমস্ত কাজের সঙ্গে-

সঙ্গে আমার কাজকর্ম্ম দিনে দিনে ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিত হয়ে উঠ্ছিল। তোমার সমস্ত কাজের সুবিধা অসুবিধা দেখে আমি যে কেন তার সুব্যবস্থা এতকাল ধরে করে এলাম তা তুমি বুঝ্লে না। আমার না হয় ভয় ছিল তুমি পাছে ধরে ফেল, তা বলে তুমি কি এম্নি অন্ধ হয়ে ছিলে যে এতদিনেও টের পেলে না ?

তোমায় জানিয়ে তোমার কাজ করা, কথা শোনা, তোমায় দেখা, আমার যত কমে আস্তে লাগ্ল, আড়ালে সেটা ততই বেড়ে উঠ্ল। কখন্ যে কিসের অবসর মিল্বে সব আমার নখের আগায় গোনা ছিল। আমি জান্তাম, এতে আমার কোনো পাপ নেই, শুধু তৃপ্তি আছে। তোমার অনিষ্ট এতে এক বিন্দু হবে না। আর আমারই বা কেন হবে ? তুমিই ত আমার দেবতা ; গোপনে দেবতার পূজায় কি পাপ আছে ?

মন্দিরে ঠাকুরকে প্রণাম কর্তে আমি রোজ ভোরেই যেতাম। তখন আমার সমস্ত সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনার কথা তাঁকে জানিয়ে আস্তাম। আমি যে তোমারি জন্যে তোমার সঙ্গে ছলনা

করেছি, নিজের সঙ্গেও করেছি, সে কথাও বল্‌তে ভুল্‌তাম না।

কিন্তু বল্‌লে কি হবে? তোমার জন্যে আমি সেই দেবতার সঙ্গেও ছলনা করেছি। আজ মাথা হেঁট করে সে অপরাধ স্বীকার কর্‌ছি, চিরজাগ্রত ঠাকুর দুঃখিনী অবলাকে ক্ষমা কর্‌বেন। আরতির সময় হাত জোড় করে মাথা নীচু করে রোজ সন্ধ্যায় যখন আমি শিবমন্দিরে ওই পাষাণ-প্রতিমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাক্‌তাম, তখন কি আমি তার পূজা করতাম? আমি তখন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব কর্‌তাম, তোমার দৃষ্টির অভিষেক। তুমি যে তোমার শুভ্র নির্ম্মল অকলুষ দৃষ্টি দিয়ে আমার এ পাপ দেহকে স্নান করিয়ে তিলে তিলে তার অণুপরমাণুকে পবিত্র করে তুল্‌তে, আমি আমার সমস্ত মন দিয়ে তাই অনুভব কর্‌তাম। আর ভাব্‌তাম তপস্যার শেষে সিদ্ধিলাভের দিন আমার এগিয়ে আস্‌ছে। এ জন্মে তোমার দৃষ্টির তলে নিষ্পাপ হয়ে উঠে পরজন্মে তোমাকেই লাভ কর্‌ব। তখন দেবমন্দিরের আরতির শব্দ আমার কানে মিলিয়ে যেত। ঘিয়ের পঞ্চপ্রদীপের আলো কি ঘ্রাণ আমার কোনো

ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করত না। শব্দ, গন্ধ, রূপ, রস, সব তখন তোমাতেই একাকার। আজও সে মন্দিরের হাওয়ায় প্রতিসন্ধ্যায় আমি তোমাকেই অনুভব করে পুলকিত হয়ে ঘরে ফিরে আসি।

ঘরে এসে তার পর ভয় হত, দেবতার সঙ্গে ছলনা করে আমি যদি তোমার অকল্যাণ করে থাকি? তবে তার বাড়া শাস্তি আর আমার কি হতে পারে? আরো মনে হত পাষাণের ঠাকুরের উপর ত তোমার বিশ্বাস নেই, তবে তুমিও ছলনা করেছ? যদি করে থাক তবে সে আমারি জন্যে, সে পাপও আমারি। তখন আমি শিউরে উঠে তোমার মঙ্গলের জন্যে আমার দেহ মন সমস্ত মানত করতাম।

দাদামশায় বলেছিলেন, মানুষের পাপ দেবতাকে স্পর্শ করে না। তাই আমি ঠিক করলাম মন্দিরের সেবাতেই আমি আমায় উৎসর্গ করব। শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ মন্দিরের দরজা ধরেই এ বাড়ীতে পড়ে থাকব; তোমার ঘরবাড়ী আমি দাদামশায়ের হাজার কথাতেও নিতে পারিনি, সে তোমাকেই আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। মন্দিরের কাছে ছোট একখানি ঘর বেঁধে থাকবার আমার সাধ ছিল।

ইচ্ছা ছিল ঐখানে থেকে দেখ্‌ব, তোমার ঘর আলো করে তোমার গৃহলক্ষ্মী তাঁর শুভস্পর্শে সোনার সংসার সাজিয়ে তুল্‌ছেন। কিন্তু সে সাধ আমার মিট্‌বে কি না কে জানে? আমি জানি মিট্‌বে না, কিন্তু প্রাণ ধরে ও-কথা বল্‌তে কিছুতেই পারি না। এখনও সেই আশাতেই তোমার ঘর আগ্‌লে বসে আছি।

আজ কতদিন ধরে রোজ ভোরে স্নান করে মন্দিরের সিঁড়ি ধুয়ে ফুল সাজিয়ে, আঙিনা ঝাঁট দিয়ে আসছি। আমি সকলের অধম হলেও এ কাজে আমায় বাধা দিতে কেউ নেই। রোজ সন্ধ্যায় নিজের চুলের গোছা দিয়ে আমি মন্দিরের ধূলো মুছে নিয়ে যাই। সেই যেমন তখনকার দিনে কর্‌তাম, আজও তেম্‌নি করি। কিন্তু আজ সে পদধূলার এক কণাও মাথায় তুলে নেবার জন্যে পড়ে নেই।

এখন আমাদের মন্দিরে আর তেমন লোকের ভিড় নেই। কিন্তু তোমার মনে আছে ত তখন আরতির সময় মন্দিরে লোক আর ধর্‌ত না। মেয়ের ভিড় যত না হোক ছেলের ভিড় তার চেয়ে ঢের বেশী। গাঁ ভেঙে ছেলেরা রোজ মন্দিরে এসে

জুট্‌ত। তাদের জ্বালায় আমার চলাফেরা ভার হয়েছিল।

আষাঢ় মাসের শেষাশেষি সেই যেদিন ঝড়ে আকাশ-পাতাল তোল্‌পাড় হয়ে উঠেছিল, সেই অমাবস্যার দিনে ঘন মেঘের ঘটায় আরতির অনেক আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। আম বাগানের কত গাছ যে সেদিন ভেঙেছিল, নদীতে কত নৌকো যে ডুবেছিল, নদীর পাড়ও যে কত জায়গায় ধসে পড়েছিল, তার ঠিকানা নেই। সেদিন প্রকৃতির প্রলয়কাণ্ড দেখে লোকের চোখের ঘুম কোথায় উড়ে গিয়েছিল। সারারাত ধরে কড়্‌কড় করে বাজ পড়েছে, ঝুপ্‌ঝুপ করে নদীর পাড় খসে খসে পড়েছে, সাঁ সাঁ করে ঝড় গাছপালা উপ্‌ড়ে বন-বাদাড় ভেঙে ছুটেছে, আর ঝম্‌ ঝম্‌ বৃষ্টি ত সারারাত্রির মধ্যে একবারও থামেনি।

জোরে ঝড় আরম্ভ হবার আগেই তাড়াতাড়ি করে আরতি হয়ে গেল। সকলে বেরিয়ে বাড়ী চলে গেল। আমি তখন বাড়ী গেলাম না, মনে হল মন্দিরের কাজ শেষ করে গেলেই হবে, নইলে হয়ত আবার আস্‌তে পার্‌ব না। তুমিও যে যাওনি,

তা' আমি জানতাম না, কিন্তু আমি যে যাইনি তা তুমি জান্‌তে। মন্দিরের দাসীর কাজ আমি কোনো দিন কারুর চোখের সাম্‌নে করিনি, এমন কি পূজোরী-ঠাকুরও আমায় কাজ কর্‌তে কখনো দেখেনি। আমি ফুল দিয়ে যাই এইটুকুই সে জান্‌ত, আর কিছু কেউ জান্‌ত না। তাই বোধহয় তুমি আমায় থাক্‌তে দেখে একটু অবাক হয়ে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যেই মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলে।

সবাই চলে যেতেই আমি এদিকের সিঁড়ি ধুয়ে মুছে, প্রদীপ পরিষ্কার করে রেখে, তোমাদের দিকের সিঁড়ির কাছে গেলাম। হেঁট হয়ে খোলা চুল দিয়ে আমি যখন সিঁড়ির ধূলো মুছ্‌ছিলাম, তখন প্রদীপের আলো আমার জরির আঁচ্‌লায় লেগে চক্‌চক করে উঠ্‌তেই বোধ হয় সে দিকে তোমার চোখ পড়েছিল। সেদিন আমি রূপোলি জরির-পাড়-আর-আঁচ্‌লাদার একখানা কাপড় পরে ছিলাম। তুমি এগিয়ে এসে আমায় অমন ভাবে দেখে বল্‌লে, "সুনন্দা, এত রাত্রে পাষাণের ঠাকুরের সিঁড়িতে মাথা পেতে পড়ে আছ কিসের টানে ?"

ইচ্ছা হচ্ছিল, সত্যি কথাটা বলি। কিন্তু আমি যে পণ করেছিলাম, যেদিন তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হবে, সেই দিনই আমার মনের কথা বল্‌ব ; তার আগে বল্‌লে ত চল্‌বে না। তাই বল্‌লাম, "ঠাকুরের টানেই ঠাকুরের দরজায় পড়ে আছি।"

আমার উত্তর শুনেই তুমি হঠাৎ বলে উঠ্‌লে, "এ কি, তুমি চুলের গোছা দিয়ে সিঁড়ির ধূলো কুড়োচ্ছ ? কে এমন ভাগ্যবান যার পায়ের ধূলো তোমার মাথার চুল স্পর্শ কর্‌বার স্পর্দ্ধা রাখে ?"

আমি হেসে বল্‌লাম, "স্পর্দ্ধা কেউ রাখে না। তবে আমার যে প্রিয় তার পায়ের ধূলো আমি আপনি সগৌরবে মাথায় তুলে নি।"

অন্ধকারে তোমার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। মনে হ'ল গলার স্বরটা একটু ভারী-ভারী শোনাল। তুমি বল্‌লে, "সে তোমায় কি দিয়েছে, যে, তার এত মান ?"

"সে কি দিয়েছে সেই জানে, আমি যতখানি দিতে পারি দিয়েছি।"

"আর কারুর জন্যে বুঝি এক কণাও রাখনি।"

আমি বেশ স্থির ভাবেই বল্‌লাম, “না।”

তুমি বল্‌লে, “সুনন্দা, তবে সত্যই আমার সব আশা বৃথা।”

আমি বল্‌লাম, “ওমা, তোমার আবার আমার কাছে কিসের আশা ?”

তুমি কথা কইলে না ; চলে গেলে। আমিও উঠে বাড়ী গেলাম।

পরদিন ভোরে উঠে দেখ্‌লাম, এক রাত্রের ঝড়ে মাধবপুরের চেহারা বদ্‌লে গেছে। কোথাকার কি যে কোথায় গেছে, কত ঘর বাড়ী বাগান যে ধ্বংস হয়ে গেছে, তা গোনা যায় না। আমারও সব সেদিন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কি না জানি না।

সেদিন থেকে তোমায় ত আর দেখিনি। পথ চেয়ে আজ কতদিন বসে আছি। যাবার দিনে তোমায় সব বলে যাব সেই আশাতেই যত্নে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। যদি না পারি তবে এই আমার লিপি রইল, যা বল্‌বার তা’ এতেই বলে গেলাম। তবে এক সাধ ছিল—তোমায় নিজে মুখে বলে যাব ; তোমার মুখে আনন্দের হাসি দেখে, আমিও আনন্দেই হেসে যাব, দুঃখের জোর-করা হাসি

সেদিন আর হাস্‌ব না। যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় হব, সেদিন আমার এই অশ্রুসাগরে ওই একটি দিনের স্মৃতি শ্বেতপদ্মের মত টল্‌টল করবে। কিন্তু সে সুখ কি আমার হবে?—

অভাগিনী সুনন্দা।

পৌষপার্ব্বণ

(১)

সন্ধ্যা তখন হয়ে এসেছে। রাঙা সূর্য্যের উগ্র মূর্ত্তি আর নেই। তিনি তখন পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে সিঁদুরের ফোঁটার মত স্নিগ্ধ শোভা ছড়াচ্ছেন। ঢেঁক্‌শালে বসে বসে দত্তদের বিধবা বৌ স্থরমা চাল ঝাড়তে ব্যস্ত। পাড়ার তুটি চাষীদের মেয়ে ঢেঁকিতে পাহার দিচ্ছে। তাদের চরণস্পর্শে উৎফুল্ল হয়ে ঢেঁকি ঢকর-ঢক্ করে নেচেই চলেছে। স্থরমা কুলোখানা নামিয়ে মাঝে-মাঝে এক-একবার পশ্চিমের মাঠের পারের ধূলায় ধূসর রাস্তাটার দিকে যখন চেয়ে দেখ্‌ছিল, তখন চাষাদের মেয়ে ফেলী প্রায়ই একটু নরম স্থরে বলে উঠ্‌ছিল, "আহা বৌঠান, অত উতলা হও কেন? গোপাল দাদা এই এল বলে।"

বই বগলে একটি শ্যামবর্ণ রোগা পাত্‌লা ছেলে এসে দাঁড়াল। মাথায় তার একরাশ চুল, চোখ তুটি বড় বড়, হরিণ-শিশুর মত কেমন যেন অসহায় দৃষ্টি।

ছেলেটি লম্বায় নেহাৎ কমসম নয়, কিন্তু মুখখানি তার মায়ের কোলের কচি ছেলের মতই ঢল্‌ঢলে। এই কিশোর বালকটিকে দেখ্‌লে তার অতখানি দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও বোধ হয় মেয়েরা একটু আদর করে গাল না টিপে থাক্‌তে পারে না।

সুরমা চোখ তুল্‌বার আগেই গোপাল বইগুলো ঝুপ করে একটা চালের ধামার মধ্যে ফেলে দিয়ে তার আঁচল ধরে টানাটানি বাধিয়ে দিলে। চাবির গোছা এক নিমিষে আঁচল ছেড়ে গোপালের হাতে এসে হাজির। তার পর গোপালের সে কি নাচ! সুরমা হাত বাড়িয়ে যত বলে, "আরে, চাবি নিয়ে কোথা যাস্? শীগ্‌গির দে, কোথায় হারিয়ে ফেল্‌বি, তার পর আমি রাজ্যি সুদ্ধ খুঁজে বেড়াব।" গোপাল তত লাফিয়ে লাফিয়ে দূরে যায় আর বলে, "দেব না, কি মজা; হাতে পেয়েছি আর ছাড়্‌ছি না; বল আগে চার আনা পয়সা দেবে, নয়ত এই দৌড় দিচ্ছি একেবারে তালপুকুরের পাড়ে।" বল্‌তে না বল্‌তে, গোপাল, দৌড়তে সুরু কর্‌ল। বৌ অগত্যা হাতের কাজ ফেলে "এই বাঁদর ছেলে থাম বল্‌ছি; লক্ষ্মীটি ভাই গোপাল অমন করে

না” ইত্যাদি নানা কথা বল্তে বালকের পিছনে ছুট্লেন। ঢেঁকশালের সাম্‌নের নিকোনো তক্‌তকে মস্ত উঠোনটা পার হতেই বাইরে দরজার পাশ থেকে গ্রামের ডাক-হর্‌করা ডেকে বল্‌লে, “বৌমার চিঠি আছে একখানা।” বৌমা এলোচুলের উপর ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে কপাটের আড়াল থেকে হাতখানা বের করে দিলেন, কোথা থেকে গোপাল এসে ফস্‌ করে চিঠিখানা নিয়ে উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। “ও ভাই বৌঠান, তোমার নামে চিঠি! কে লিখেছে, বল না ভাই। খুলে দেখি না আমি।” গোপালের আর তর সয় না। না জানি কি একটা নূতন খবর আছে! সেটা না জেনে চিঠিখানা হাতে করে অপেক্ষা করা কি কম কথা! গোপাল সে পার্‌বে না, এখুনি তার সব জানা চাই। বৌঠান ঘরে গিয়ে তবে চিঠি খুল্‌বে, তার পর পড়্‌বে; তার পর গোপালের হাতে দিতেও পারে, নাও দিতে পারে।

বৌঠানের কিন্তু অত তাড়া দেখা গেল না। তার মুখখানা চিঠির নামেই কেমন যেন শুকিয়ে এল। কথার কোনো জবাব না দিয়ে কেবল হাত বাড়িয়ে

চিঠিখানা সে চেয়ে নিলে। গোপাল বৌঠানের নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে তার অমন মুখ দেখে মুহূর্ত্তের মধ্যে শান্ত হয়ে গেল। বৌঠানের মুখের সব ভাবই তার চেনা। সে মুখে কি একটা অমঙ্গলের ছায়া দেখে তুরন্ত ছেলেটির ঢল্‌ঢলে স্নিগ্ধ চোখদুটিও ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। সুরমার সকল ব্যথাই যে তার মনে ব্যথার সঞ্চার করে, এ কথা সে নিজে হয়ত কোনো দিনই স্পষ্ট করে অনুভব করে নি; কিন্তু সেই ব্যথার গোপনস্পর্শে তার অনন্দ-উচ্ছ্বাস আপনি থেমে যেত, তার কচি মুখখানির উপরও বিষাদের ছায়া এসে পড়্‌ত।

ঘরে গিয়ে গোপাল বল্‌লে, "কি ভাই বৌঠান, চিঠিতে বুঝি কিছু মজার কথা নেই?" বৌঠান বল্‌লে "না।" তখনি একবার "ওঃ!" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কখন্ যে আবার সে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে নিজেও টের পায়নি, সুরমাও পায়নি।

"বৌঠান চিঠি কে লিখেছে?" শুনেই সুরমা এক টানে বলে গেল, "আমার বাপের বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, আমায় একবার সেখানে যেতে হবে।"

গোপাল কেমন একটু চম্‌কে উঠে আগ্রহ-ভরে বল্‌লে, "আর আমাকে ?"

"তোমাকে না ভাই, তুমি এইখানেই থাক্‌বে।"

কচি মুখখানি আঁধার করে গাল ফুলিয়ে সে বল্‌লে, "একলাটি ? তুমি আর আস্‌বে না বুঝি ?"

কথা বল্‌তে গোপালের গলার স্বর ভারী হয়েছিল কি না কে জানে ? সুরমার কানে কিন্তু গলাটা কেমন ভার-ভার ঠেক্‌ল। মনে হল চোখের জলে তার কচি গলা একটু যেন মোটা হয়ে আস্‌ছে। তাই গোপালের আগেই তার বৌঠানের চোখ জলে ছল্‌ছল করে উঠ্‌ল। কিন্তু গোপাল দেখ্‌লে ভাব্‌বে কি ? হেসে কথা কইতেই হবে। সুরমা বল্‌লে, "ওমা আস্‌ব না কেন ভাই ? চট্‌ করে ফিরে আস্‌ব। তোমার কিনা ভাই পড়াশুনো, তাই তোমায় রেখে যেতে হল। নইলে ভাইটিকে ছেড়ে কি আমি থাক্‌তে পারি।"

গোপাল অত আদর-সোহাগের কথা পছন্দ করে না। সে এখন বড় হয়েছে, বৌঠানের ওসব ছেলে-ভুলোনো কথা শুন্‌লেই তার লজ্জা করে। ম্লান মুখে একরাশ হাসি ফুটিয়ে সহজে তার নরম মুখ-

খানি বৌঠানের মুখের দিকে তুলে গোপাল খুব একটা লম্বা টান দিয়ে বল্‌লে, "আরে ভারি ত! আচ্ছা যাও না, কি আর হয়েছে? আমি বুঝি একলা থাক্‌তে পারি না ভেবেছ? চাল ডাল সব রেখে যেও, ফেলীকে বোলো বাসন মেজে রোজ একবারটি উনুনটা ধরিয়ে দিতে, ব্যস্‌! দিব্যি থাক্‌ব। হ্যাঁ, আর একটা টাকা দিয়ে যেও; আমি শশীপুরের মেলায় যাব। বুঝ্‌লে? উনুনটা কিন্তু ভাই আমি ধরাতে পারি না, সেটা বলে যেও।"

গোপাল আপন মনে নিজের ভবিষ্যৎ ঘরকন্নার আনন্দের ব্যাখ্যা করতে করতে বেরিয়ে চলে গেল। সুরমার কিন্তু কথাগুলো মনের মত হল না। গোপাল কান্নাকাটি গোল্‌মাল কিছু না করলেই ভাল, নইলে রেখে যাওয়া শক্ত হবে। কিন্তু তবু কেন জানি না, তার হৃদয়ের ভালবাসা একটু কান্না-কাটির পথ চেয়েই বসে ছিল। বৌঠান গোপালকে ছেড়ে চলে যাবে, আর গোপাল কিনা ওই দুটো কথা কয়েই অভিমানের পালা শেষ করে আনন্দের গান সুরু করে দিলে! সুরমার মন চাইছিল গোপাল চুপচাপ থাকে, কিন্তু তার মনের মন

আড়াল থেকে চাইছিল গোপালের কান্না। কেন সে এমন করে নিরাশ করে দিয়ে গেল? ভাল থাক ভালই, চলে যাবার পর আনন্দ করুক, কিন্তু যাবার কথা শুনে যদি দু ফোঁটা চোখের জল পড়্ত! সুরমার মন আপনা থেকেই সিদ্ধান্ত করে বস্‌ল— আমার মন খারাপ হবে বলে ও অমন ছল করে চলে গেল। মনে ওর খুবই লেগেছে; নইলে কথাটা শুনেই চম্‌কে উঠ্‌বে কেন? বেরিয়ে যাবার সময় কেমন যেন চট্ করে ছুটে চলে গেল; চোখে বোধ হয় জল আস্‌ছিল।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার সময় গোপাল কোনো কথাই কইলে না। সুরমা আঁচল আড়াল দিয়ে প্রদীপটা নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়া থেকে শোবার ঘরে গিয়ে উঠ্‌ল। মাজা পিতলের পিলশুজের উপর প্রদীপটা রেখে সুরমা যখন বিছানা ঝাড়্‌তে ব্যস্ত, ততক্ষণে গোপাল এসে হাজির। জলচৌকির উপর সাজানো ঘরের বাসনগুলির গায়ে ম্লান আলোর রেখা পড়ে চিক্‌চিক্ কর্‌ছিল, গোপাল তারি আশেপাশে খানিক ঘুরে হঠাৎ আঙুল দিয়ে সুরমার লম্বা চুলের একটা গোছা জড়াতে সুরু করে দিলে।

সুরমা বল্‌লে, "আঃ করিস কি, লাগে না ?"

গোপাল তার উত্তরে একেবারে বলে রসুল, "বৌঠান ভাই, পিঠে পার্ব্বণ কবে ? তখন্ তুমি আস্‌বে ত ? নইলে আমায় পিঠে করে দেবে কে ?"

ছোট দেওরটির ওইটুকু টানের কথাতেই সুরমার স্নেহভিক্ষু মন নরম হয়ে এল। এ ত পিঠে খাবার ভিক্ষা নয়, এ বৌঠানকে পাবার জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন। সে তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "হ্যাঁ ভাই, নিশ্চয় আস্‌ব। কত কত পিঠে করে তোমায় খাওয়াব। সেখানে বসে থাক্‌লে আমার অত পিঠে খাবে কে ? বাবা মা বুড়োমানুষ, তোমার সিকির সিকিও খেতে পার্‌বেন না।" দেওর বৌঠানের কথায় বেজায় খুসী ; হ্যাঁ, বৌঠান আমায় চিনেছে বটে !

পাশাপাশি দুখানা তক্তাপোষে শুয়ে সে রাত্রে দুজনের কত না গল্প ! সুরমা একরকম শ্রোতাই ছিল, বক্তা গোপাল। সুরমার মনটা বাপের বাড়ীর দুঃসংবাদ পেয়ে কেমন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ; মনের ব্যথা মনে চেপে বেশী কথা কইতে সে

পারে না। কিন্তু আদরের দেওরটির আনন্দকল্লোল পাছে তাঁর মৌনতার কঠিন স্পর্শে থেমে যায় তাই প্রদীপের আলোর দিকে পিছন ফিরে সে দু-চারটে কথা বলে কথার ধারাটা বজায় রাখ্ছিল। সে কত সাত রাজ্যের সাত শ' রকম কথা! কবে কোথায় মেলায় অন্ধ ভিখারী একলা মেলার দরজার বাইরে বসে আপন মনে গান গাইত, তার করুণ মুখের সেই বিষাদমাখা দুঃখগাথার কথা; আবার কোথায় বিজয়ার দিনের ঘটার বাইচ লড়ার কথা; কখনও বা শীতের সন্ধ্যায় দোলাই গায়ে আগুনের পাশে বসে গরম গরম মুড়িফুলুরি খাওয়ার সখের কথা ওঠে, কখনও বা গুরুমশায়ের হাতে পাঠশালার ছেলেদের অনন্ত দুর্দ্দশার কথা ওঠে। কত সুখদুঃখ হাসিকান্নার স্মৃতিজড়িত সে-সব গল্প! কোন্ কথার মধ্যে গোপাল হঠাৎ বলে বস্‌ল, "জানো বৌঠান, আজ সন্ধ্যায় কেন এত দেরী করে বাড়ী এলাম? যদু-ময়রা গুরুমশায়কে খবর দিলে পাড়ায় নাকি একটা আড়কাঠি এসেছে। সে কি-রকম কাঠি ভাই, আমি ত কখনও দেখিনি! বল্‌লে, গোয়ালা-পাড়ার পাশের সেই নীলকুঠির লাল ইটের ঘর-

খানার কাছেই নাকি দেখা যাবে। আমরা সবাই ত দে দৌড়। ছুটে আমার সঙ্গে কে পারে বল? কিন্তু গিয়ে দেখি রাজ্যের খড়কুটো পাতাকাঠি জড়ো করে দিব্যি আগুন জ্বেলে একটা মস্তমোটা লোক জোড়া চাদর গায়ে দিয়ে হাতদুখানা বাড়িয়ে পা মেলে খুব আরামে বসে আছে। সবাই বল্লে কি না, ওই লোকটাই আড়কাঠি। আমাকে বোকা পেয়েছে কিনা, কিছু না পেয়ে যা তা বুঝিয়ে দিলে। আমি বাবা, তেমন ছেলেই নয়; সোজা গিয়ে বলে এলুম, 'মশায়, আপনাকে এরা কাঠি না কুটো কি বল্‌ছে শুনেছেন?" সে শুনে হেসেই অস্থির। হাসির চোটে তার প্রকাণ্ড ভুঁড়িটা দুলে দুলে উঠ্‌ছিল। ওরে বাস্‌রে, তার সে চেহারা নয় ত, যেন ঢাকাই জালা।"

বৌঠান মৃদু গলায় সংক্ষেপে উত্তর দিলে, "তাই নাকি?"

ভোরে কাক কোকিলও ডাকেনি, এমন সময় সুরমা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছে। গোপাল তখন দুই হাতে বালিশটা আঁক্‌ড়ে হাঁটু দুটো বুকের কাছে এনে লেপের তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে

অগাধ নিদ্রায় মগ্ন। শীতে জড়সড় ঘুমন্ত ছেলেটির মুখে ঘুমের মধ্যেই হাসি ফুটে উঠেছে। বোধ হয় ঢাকাই ঝালার দোলায়মান দেহের তরঙ্গ স্বপ্নে তাকে তখনও হাসি জোগাচ্ছিল। ডালিমফুলের নক্‌সা-করা একখানা পোষাকী বালাপোষ আল্‌নায় ঝুল্‌ছিল; সুরমা গোপালের গায়ে সেইখানা চাপা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল। খিড়্‌কির পুকুর-পাড়ে অত ভোরেই পল্লীবধূদের দুচারজনের দেখা মেলে। চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে দত্তদের ওবাড়ীর বড় মেয়ে এসে উপস্থিত। বৌকে দেখে একটু হেসে বল্‌লেন, "কি বৌ, বড় ভোর-ভোর যে! গোপাল ভাল ত?"

সে বল্‌লে, "হ্যাঁ দিদি, গোপাল ভালই। আমার বাপের বড় অসুখ, যেমন-তেমন নয়, বসন্ত। মন বড় খারাপ, আজ দুপুরে বেরিয়ে রাতের গাড়ী ধর্‌তে হবে।"

ঠাকুরঝি বল্‌লেন, "আহা বড় ভাল লোক বোস মশাই। মা শেতলা ভালয় ভালয় রেখে গেলেই ভাল।"

বৌ একটু আম্‌তা-আম্‌তা করে হঠাৎ বল্‌লে,

"ঠাকুরঝি, তোমার বাড়ীই যাব ভেবেছিলাম। গোপালকে ত সেখানে নিয়ে যাবার নয়। তুমি যদি তাকে এ কদিন রাখ তবেই...।"

দিদির মন ছিল ভাল; বল্‌লেন "ওমা, তা রাখ্‌ব বৈ কি। ভাইটিকে দু-দিন কাছে ত বড়-বোনে রেখেই থাকে।"

সুরমা চুপিচুপি এইবার আসল কথাটি পাড়্‌লে, "জানই ত ঠাকুর-ঝি, ভাইটি তোমার আমায় দুদণ্ড চোখের আড়াল করে না। ভুলিয়ে রাখ্‌বার জন্যে বলেছি পিঠে-পার্ব্বণের আগেই আস্‌ব। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, সে হবার নয়। তাই বল্‌ছিলুম কি, তোমার ভাই, পর নয়—তুমি ত দেখ্‌বেই, তবে কিনা একটু চোখে চোখে রেখ; বড় অভিমানী, পার্ব্বণের দিন হয়ত কান্নাকাটি করবে। তা' তোমায় অবিশ্যি বল্‌তে হবে না, আমার চেয়ে তোমার টান কম ত আর না—রক্তের টান। তবে একবার বল্‌লাম।"

ঠাকুর-ঝি বল্‌লেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখ্‌ব শুন্‌ব, পিঠে করে দেবো। তোমার কোনো চিন্তা নেই বৌ।"

বেলা বারোটায় একখানা গরুরগাড়ী দরজায়

দাঁড়াল।••গোপাল তখন বাক্স খুলে শশীপুরের মেলার জন্যে পোষাক গোছাতে ব্যস্ত। ভাই-ফোঁটার পাওনা জরিপেড়ে কাপড়খানা তুহাতে ঘসে ইস্ত্রি করা চল্‌ছে। একটা সবুজ ডোরাকাটা টিনের ছোট বাক্স, একটা বড় ধামা, তার উপর লাল গাম্‌ছার চার কোণে বাঁধা চারটে ছোট পুঁট্‌লি গাড়ীর মধ্যে তোলা হল। তারপর নীল একখানা পুরানো শাল গায়ে দিয়ে ভিতরের ঘরের গায়ে চাবি দিয়ে সুরমা গাড়ীর দিকে এগিয়ে এসে গোপালকে দেখে বল্‌লে, "গোপাল, আমার যে সময় হয়েছে।" গোপাল ঠোঁটটা একটু ফুলিয়ে বড় বড় চোখতুটি তুলে একবার বৌঠানের মুখের দিকে তাকালে, হাত তুখানা তখনও তার বাক্সের মধ্যে। বৌঠান তার নরম গালতুটি টিপে কপালের উপর একবার নিজের মুখটা ঠেকালে। প্রণাম করতেও গোপালের তখন সময় নেই। সে আবার বাক্সের মধ্যে মুখটা ঢুকিয়ে দিলে। গাড়ীর ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে গোপাল আবার একবার মুখ তুলে চেয়ে দেখ্‌লে বৌঠান গাড়ীর ছইএর পিছনের চটের পর্দ্দাটা তুলে গোপালের দিকেই চেয়ে আছে৽।

সারা পথ সুরমার মন কেবল গোপালের জন্যেই আকুলিবিকুলি করছিল। বাবার কথা যে তার মনে পড়েনি, তা নয়; তবে যে-বন্ধন শৈশবে সমাজ নিষ্ঠুর হাতে ছিঁড়ে কচি মেয়েটির মন রক্তে রাঙা করে দিয়েছিল, আজ সেই ক্ষত পূর্ণ করে সেখানে নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে। যতবার সে আজ বৃদ্ধ পিতার মুখ মনে করতে চাইছিল, ততবারই সেখানে জেগে উঠছিল কোঁকড়া কালো চুলে ঘেরা একটি কিশোর মুখের শ্যাম শোভা। বাড়ীর পেছনে বাঁকা বাঁশের মাচার উপর যেখানে লাউগাছ সহস্র ফণা তুলে ঊর্দ্ধমুখী হয়ে পড়ে আছে, পথের মোড় ফেরবার সময় পর্য্যন্ত সেইখানটি দেখা যায়। সুরমা যতক্ষণ দৃষ্টি চলে সেই দিকে চোখ মেলে বসে ছিল। কেবলি মনে হচ্ছিল, এইবার গোপাল একবার বেরিয়ে আসবে, মাচার পাশ থেকে হয়ত দুষ্টুমি করে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে তাকে ডাকবে। কিন্তু সে ত এল না। তবে বুঝি ঘরে মেজেয় পড়ে কাঁদছে। সুরমার ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে একবার সহস্র চুম্বনে গোপালের চোখের জল মুছে দিয়ে আসে। কিন্তু গোপাল তখন

শশীপুরের মেলার চিন্তায় বিভোর। আর বৌঠান ভাব্‌ছে, আস্‌বার সময় গোপাল কথা কইলে না, প্রণাম করলে না, বুঝি কথা কইতে গেলে চোখের জল ঝরে পড়্‌ত। সুরমার মনে সেই বড় বড় চোখের অসহায় দৃষ্টি ঘুরে ফিরে কত কান্নার নালিশ জানিয়ে যাচ্ছিল। সেই যে বাক্সর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ঠোঁট ফুলিয়ে মুখখানা উঁচু করে গোপাল শুধু একবার চেয়েছিল, সেই তার নীরব অভিযোগ মনে করে সুরমারই চোখ ছল্‌ছল করে উঠ্‌ছিল।

সোনার অঙ্গ ধূলায় পেতে সুরগুঁজার ক্ষেত হাসিমুখে মাঠের মাঝখানে পড়ে আছে। সুরমার গাড়ী তারি পাশ দিয়ে ঝড়াং ঝড়াং করে হেল্‌তে দুল্‌তে চলেছে। আজ তার মনে পড়্‌ছে, অনেক দিন আগেকার আর-এক পৌষের কথা। বিয়েরও আগে এমনি সোনার ক্ষেতের ভিতর দিয়ে দশবছর বয়সের সময় মাস্‌তুতো বোনের শ্বশুরবাড়ী দেখ্‌তে দিদির সঙ্গে সে এই গাঁয়েই এসেছিল। দিদি একদিন দত্তদের বাড়ী নূতন খোকা দেখ্‌বার জন্যে তাকে নিয়ে যায়। সেই দিনই মায়ের কোলে প্রথম

সে গোপালকে দেখে। আজ মনে পড়্‌ছিল, মুখ নীচু করে ঝুঁকে পড়ে সে যখন খোকার মুখ দেখ্‌তে যায়, তখন তার কাঁধ পর্য্যন্ত কোঁকড়া চুলের গোছা এলিয়ে পড়ে খোকার নরম নরম হাতের কাছে ঝুলে পড়েছিল। সেই চার মাসের কচি খোকা সেই দিনই তার মধ্যে কি দেখ্‌লে জানি না, খিল্ খিল্ করে হেসে তখনি কিন্তু সে ছোট ছোট গোলাপী হাতের মুঠোয় তার চুলের গোছা চেপে ধর্‌লে। সত্যি, খোকা সেইদিনই কি করে তাকে চিনে ফেল্‌লে, আজও সে কথার অর্থ সুরমা ভেবে পায় না। তখন কে জান্‌ত ঐ সুরমাই দত্তবাড়ীর বড় বৌ হবে, আর কেই বা জান্‌ত যে ঐ অতটুকু খোকা আজ সুরমার সর্ব্বস্ব হয়ে বস্‌বে ?

তেরো বছর বয়সে দ্বিরাগমনে শ্বশুরবাড়ী এসেই সুরমা বিধবা হয়। সেই বছরই বড় ননদ বিয়ে হয়ে স্বামীর ঘর কর্‌তে চলে গেল। অতবড় ছেলের শোকে শাশুড়ী সেই যে শয্যা নিলেন, এজন্মে আর সে শয্যা তাঁকে ছুটি দিলে না। তিন বছরের খোকা সব হারিয়ে বৌঠানকেই সম্বল কর্‌লে। বাপ-মায়ের বড় আদরের মেয়ে হয়েও তাই সে

স্বামীর শূন্য সংসার ফেলে মায়ের কোলে দুদিন জুড়তে পায়নি। চির দুর্ভাগিনী বাঙালীর বিধবা সুরমা আপন বলে গোপালকেই বরণ করে নিলে। মনের মধ্যে চেয়ে আজ যদি সে খোঁজ করে গোপাল তার কে, কিছুই ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। গোপাল তার ছেলে নয়, ভাই নয়, কেউই নয়, কিন্তু গোপালই তার সব, সেই তার বুকজোড়া সুখ, হৃদয়ভরা আনন্দ। স্বামীর মুখ তার মনে পড়ে বটে। চতুর্দ্দোলায় চড়ে চেলীর জোড় পরে বরবেশে শাঁখের মঙ্গলধ্বনি আর সানাইয়ের সুরের মাঝখানে একটি তরুণমূর্ত্তি লজ্জানম্র মুখে একদিন তারি সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার মুখখানি এখনও তেম্‌নি মধুররূপে সুরমার হৃদয়ের ছোট্ট একটি কোণ আলো করে জেগে আছে। কিন্তু শুধু উৎসবের দিনের সুখস্মৃতি দিয়ে শুধু একদিনের হাসি-গানের স্মৃতি দিয়ে মেয়েমানুষের মনপ্রাণ যে পূর্ণ হয়ে থাকে না। সে চায় একটা জীবন্ত মানুষের প্রাণের স্পর্শ। স্মৃতিকে যদি নিতান্তই সম্বল কর্‌তে হয়, তবে সে স্মৃতি সুখে দুঃখে জড়িত, হাসিকান্না-মাখা, মান অভিমানে ঘেরা পরিপূর্ণ

মানুষের স্মৃতি হওয়া চাই। সংসারের সকল আনন্দ-বিষাদের মাঝখানে, ছোটবড়র মধ্যে সেই দুদিনের উৎসবের সাথীটিকে ত সে একেবারেই পায়নি। তাই ওই বাল্য-মূর্ত্তিটিকে ঘিরেই তার যত মিলনের গান, বিরহের ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে ওঠে। স্বামী তার কল্পনার আলোয় দেবতা হয়ে দূর থেকে এখনো হাসেন, কিন্তু এই চিরদিনের সাথী কিশোর কুমারটিই তার বুকের কাছে মানুষের স্পর্শ নিয়ে তার সকল দৈন্য ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে।

(২)

পৌষ সংক্রান্তির দিনে পীড়িত পিতার সেবায় ব্যস্ত সুরমার মন যতবার সুযোগ পেয়েছে কেবলি দত্তবাড়ীর শূন্য ঘরখানির দিকে উধাও হয়ে ছুটেছে। আজ তার গোপালের কাছে ফিরে যাবার কথা; কিন্তু সে যে হবার নয়। গোপালের শশীপুরের মেলা ফুরিয়ে গেছে। বাঁশীর সুরের মোহন মোহ, হাজার আলোর মধুর স্বপ্ন, সব টুটে গেছে। বেঁধে রাখ্‌বার সকল স্বর্ণশৃঙ্খল আজ ছিন্ন! এখন শূন্য মনটি বৌঠানের কাছেই ছুটে যেতে চায়, খুঁটি-নাটির মধ্যে তার আদর-তিরস্কারগুলো স্পষ্ট করে

অনুভব করতে চায়। কিন্তু ছেলেমানুষের মন নিজের স্বভাবটা নিজেই ভালো করে বুঝতে পারছে না। থেকে থেকে কেবল বৌঠানের উপর রাগ হচ্ছে, অভিমানে ঠোঁট ফুলে উঠছে, দিদির বাড়ীর পায়েস পিঠে তার মনে ধরছে না। কি অন্যায় বৌঠানের, কথা দিয়ে কথা ভাঙে! আজও এল না কেন? সত্যি, এমন করলে কিন্তু চলবে না। এত অত্যাচার গোপাল সইবে না; যেমন করে হোক বেঁধে আনবে। গোপাল রাগের চোটে একখানা চিঠিই ফেঁদে বসল।

(৩)

মাঘ মাসের :লা কি ২রা। সকালে উঠোনজুড়ে রোদ পড়েছে। সুরমার বাপের বাড়ীর সবকটি কচি ছেলে রান্নাঘরের দাওয়ার উপর রোদে পিঠ দিয়ে মহাকলরবে বাসি-পিঠে খেতে বসেছে। কারুর ঘাড়ে-গিরোবাঁধা চেককাটা শালের গা বেয়ে রসের ধারা নামছে, কারুর বালাপোষের উপর দিয়ে পিঁপড়ের দলও ভোজের নিমন্ত্রণে যোগ দিতে চলেছে। অতি-সাবধানী কেউ পরে খাবার জন্যে ভাল পিঠেগুলি জমিয়ে রাখছে, কেউ বা লোভে

পড়ে তাড়াতাড়ি সব শেষ করে শূন্যথালা সাম্‌নে রেখে থাবার মত করে মেজেয় হাত দুখানা চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ে লুব্ধদৃষ্টিতে অন্যের পূর্ণপাত্রের রূপ দেখ্‌ছে। সুরমা কদিন ধরে এক-রকম যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাপকে ছিনিয়ে এনেছে। আজ পিতার আরোগ্যলাভের আশা দেখে এতদিন পরে তার ক্লান্ত নয়ন ঢুলে আস্‌ছে। ছেলেদের সাম্‌নে চৌকাঠের উপর জড়সড় হয়ে বসে সে ঝিমচ্ছিল। সামান্য একটু তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখ্‌লে, গোপাল বল্‌ছে, "এবার আমি পিঠে খেতে পেলাম না। বৌঠান, তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি। দেখ, আর কখ্‌খনো কথা কইব না।" ডাকহর্‌করার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। খামের উপর রস মাখিয়ে একটি ছেলে চিঠি দুখানা হাতে করে এনে বল্‌লে, "পিসিমা, তোমার দু'খানা চিঠি; বাবারে!" গোপালের হাতের লেখা দেখে আনন্দে সজাগ হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি খাম খুলে সুরমা পড়্‌লে :—

"বৌঠান, তুমি ভারি দুষ্টু হয়েছ। দাঁড়াওনা মজা দেখাচ্ছি! এমন জব্দ কর্‌ব যে টের পাবে। ভারি. না বলেছিলে পিঠেপার্ব্বণের দিনে নিশ্চয়

আস্‌বে! আমি কাল ভোরেই তোমার বাপের বাড়ী রওনা হচ্ছি, তোমায় জোর করে টেনে নিয়ে আস্‌ব। কেমন জব্দ!"

কার সঙ্গে অতটুকু ছেলে অজানা দেশে আস্‌ছে মনে করে চিন্তিত মুখে অন্যমনস্ক ভাবে দ্বিতীয় চিঠিখানা খুল্‌তেই চোখে পড়্‌ল—

"পরম কল্যাণীয়াসু,

বৌ, অনেক দিন তোমাদের কুশল-সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। পত্রপাঠ কুশল দিয়া চিন্তা দূর করিবে। পিঠে-পার্ব্বণের দিন তুমি নেই মনে করে কাল সারাদিন পিঠে করে গোপালকে খাওয়ালাম। কেমন যেন মুখ ভার করে খেলে। কিন্তু রাত্রে শুতে যাবার সময় দেখ্‌লাম বেশ হাসি-খুসি চেহারা। তারপর বল্‌তে সাহস হচ্ছে না, আজ ভোর বেলা বিছানায় গিয়ে গোপালকে না দেখে যেন মনটা কেমন করে উঠ্‌ল। চারধারে খোঁজ করে কোথায়ও পেলাম না। একটা জেলে রাত থাক্‌তে মাছ ধর্‌তে যায়। সে বল্‌লে, নীল-কুঠির সেই আড়কাঠিটার সঙ্গে ভোর রাত্রে গোপালের মত অতবড় একটি ছেলেকে ইষ্টিশানের

পথে যেতে দেখেছে। খোঁজ নিয়ে শুন্‌লাম সে লোকটাও গাঁয়ে নেই। যা হয় শীগ্‌গির একটা উপায় কর।"

সুরমা কাঠের পুতুলের মত চিঠি হাতে করে বসে রইল। তার চোখের সাম্‌নে একটি কচিমুখের দুষ্টু হাসি ফুটে উঠ্‌ছিল। সে হাসি যেন আঙুল তুলে বল্‌ছে—কেমন জব্দ !

পিতৃদায়

পৌষ মাসের শীতে সকাল বেলাই স্নান করে এসে অলকার হাড়ে-হাড়ে কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। পরণের কালাপেড়ে শাড়ীখানাই পাকিয়ে-পাকিয়ে গায়ের চারিধারে জড়িয়ে সে উত্তুরে হাওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবে মনে করছিল। উঠানের এক কোণে তখন সবে রোদ এসে পড়েছে। পোষা বিড়ালটা সেইখানে চোখ বুজে জড়সড় হয়ে পড়ে আছে দেখে অলকার কি মনে হল জানি না, সেও গিয়ে সেইখানে তুলসীমঞ্চের দিকে পিছনফিরে একঢাল চুলের আগায় একটা গিঁট বেঁধে বিড়ালটাকে কোলে করে পা-ছড়িয়ে বস্‌ল। পুষির মাথায় নরম হাতের থাব্‌ড়া দিতে-দিতে অলকা নিজেও সঙ্গে-সঙ্গে ঢুল্‌ছিল আর সেই-সঙ্গে তার পাক-দেওয়া আঁচলের কোণের চাবিটা তার বুকের উপর ঝম্ ঝম্ করে তাল দিচ্ছিল।

বৈঠকখানা-ঘরের পিছন-দিকের বারাণ্ডা দিয়ে অন্দরের উঠানে ঢুকে ত্রৈলোক্যনাথ সবুজ বালাপোষখানা গায়ে জড়াতে-জড়াতে সদ্যস্নাতা

কন্যার রাঙা মুখখানির দিকে তাকিয়ে যেন নিজেও খানিকটা সতেজ হয়ে উঠে বল্লেন, "কিগো রাণী, অলকমণি, সকালবেলা উঠে বুড়ো ছেলের খোঁজখবর না নিয়ে পুষি মেনিকে আদর দেওয়া হচ্ছে যে দেখ্ছি।"

বাবার সাম্‌নে এমন ছেলেমানুষীটা ধরা পড়ে যাওয়াতে লজ্জিত হয়ে অলকা পুষিকে এক ঠেলা দিয়ে দূর করে হেসে বল্‌লে, "না বাবা, আজ কিনা সইয়ের সঙ্গে ভোরবেলা বড়দীঘিতে স্নান কর্‌তে গিয়েছিলাম, তাই তুলসীতলায় একটু রোদ পোয়াচ্ছি। সই বলেছিল—ভোর পাঁচটায় নাকি পৌষ মাসে বড় দীঘির জলে কেউ স্নান কর্‌তে পারে না।"

বাবা মেয়ের রাঙামুখে ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে হাতখানা বুলিয়ে বল্‌লেন, "তা বেশ মা, এখন আমার খাতা-পত্রগুলো একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে দাও দেখি। আর কাউকে দিতে বল্‌তে ত আমার সাহস হয় না।"

গৃহিণী রাজেশ্বরী রান্নাঘরের দাওয়ায় ঘড়া-কাঁকালে উদয় হয়ে বিরক্ত মুখে ঝঙ্কার দিয়ে বল্‌লেন, "বলি হ্যাঁগা, সকাল বেলাই উঠে ত মেয়েকে নিয়ে

খুব আদর সোহাগ হচ্ছে, এদিকে জলটি আন্‌তে দোয়ের বার হতে-না-হতে লোকে যে আমার হাড়-মাস ছিঁড়ে খাচ্ছে। মেয়ে কি তোমার আজও কোলে করে আদর কর্‌বারই মতন আছে?' বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে মেয়ের বয়স তের আর পার হয় না, বল্‌লে লোকে বিশ্বাস কর্‌বে কেন? তাদের কি আর মাথায় এক কড়ার বুদ্ধি নেই! বলে, পরের মেয়ের বয়সের হিসেব কর্‌তে আবাগীদের এক বেলার ভুলও হয় না। এই বেলা একটা খুঁজে-পেতে বিয়ে দেবে ত দাও, নইলে আমায় এই সানে মাথা খুঁড়ে মর্‌তে হবে। লেখাপড়া নিয়ে শাম্‌লা মাথায় ধিঙ্গি হয়ে বেড়ালে, কি কথায়-কথায় ঝাঁকি দিয়ে নাক ঘুরিয়ে দাঁড়ালেই ত আর মেয়েমানুষের চল্‌বে না।”

কর্ত্তা বল্‌লেন, “বড় মেয়ের বিয়েতেই ত হাতে মালা হবার জোগাড় হয়েছিল, এরি মধ্যে আবার পয়সা কোথায় পাব? শুধু-হাতে খুঁজ্‌তে বেরলে ত আর বর মেলে না।”

গিন্নি বল্‌লেন, “সব ত বুঝি! কিন্তু তার বিয়ের সময় এ মেয়ে যে জন্মায় নি, এমন ত আর নয়।

তবে তখন থেকে এইটি মনে ভেবে দেখনি কেন যে গলায় আর-এক বোঝা ঝুল্‌ছে, তাকেও একদিন পার না কর্‌লে লোকে ঘরে আর পা দেবে না, মরণকালেও হাড়িমুদ্দফরাসে ছোঁবে না !”

অভিমানে গৃহিণীর চোখ ছল্‌ছল করে উঠ্‌ল, তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। মা-বাবার কথায় অলকার প্রফুল্লমুখ অপমানের ঘায়ে যেন কালি হয়ে গেল। সেও ঘাড় হেঁট করে উঠে চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু ত্রৈলোক্যনাথ। শীতের বাতাস যেখানে গাছের মাথায়-মাথায় নিঃশেষে উজাড় করে পাতার মাশুল আদায় করে নিচ্ছিল, তাঁর শূন্যদৃষ্টি তখন সেইখানে উদাসভাবে চেয়ে রইল। তিনি নিশ্চয় জান্‌তেন, তাঁর এ আদরিণী মেয়েটির মুখ সহজে হেঁট হয় না। সে সব দুঃখকষ্ট হাসিমুখেই সইতে পারে, কেবল পারে না তার নারী-মহিমার অপমান সইতে। তাঁর দুঃখের সংসারে অলকার হাসিমুখের আলোক-ছটাই দারিদ্র্যের অন্ধকারকে এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছে। জমিদার-বাড়ীর মেয়ের বিয়েতে শুধু কাঁচের চুড়ি আর লালপেড়ে শাড়ী পরে যেতে মা লজ্জা বোধ করাতে যে মেয়ে

দৃপ্তমুখে, মাথা উঁচু করে তার নিরলঙ্কার দেহের সৌন্দর্য্য শতগুণ বাড়িয়ে সতেজে গিয়ে পাল্কীতে উঠেছিল আজ সেই মেয়ের কালি-পারা মুখ দেখে বৃদ্ধের মনে কেবলি তার সেই সেদিনকার সগর্ব্ব হাসিটুকু ফুটে উঠ্‌ছিল। তিনি বুঝেছিলেন কত বড় কঠিন অপমানে সে আজ বিমুখ হয়েছে। তাই বৃদ্ধ পিতার ব্যথিত হৃদয় কিছুতেই সেই মুখ ভুলে অন্য কাজে লাগ্‌তে পার্‌ছিল না।

মেয়ের বিয়ে নিয়ে স্বামীস্ত্রীতে মান অভিমানের পালা এ বাড়ীতে চার-পাঁচ বছর ধরেই চল্‌ছে, কিন্তু মেয়ের সাম্‌নে বড় বেশী হয়নি। ত্রৈলোক্যনাথের ইচ্ছা মেয়ের বিয়ে এমন ঘরে হয়, যেখানে এক দিনের জন্যেও তার মানের একচুল হানি না হয়। কিন্তু হাতে একটা কাণাকড়িও না থাকাতে কল্পনাটা এতদিন ধরে তাঁর মনের ভিতরেই থেকে গিয়েছে। বড় মেয়ের বিয়েতে বড় ঠকেছেন, তাই এবার পণ করে বসে আছেন, কিছুতেই ঠক্‌বেন না। অথচ বিধাতা তাঁর পণকে নিঃশব্দে পরিহাস করে মেয়ের বয়সটা আশ্চর্য্য-রকম বাড়িয়ে তুলেছেন! আজ মেয়ের সাম্‌নে এমন নির্লজ্জ কাণ্ডটা হয়ে যাওয়াতে

তিনি সেটা পরিষ্কার দেখ্‌তে পেলেন। মনে হল—তাই ত, আমার অলকমণি যে বড় হয়ে উঠেছে, আর ত তার কাছে কিছু লুকানো যাবে না। অথচ তার জন্যে আমাদের অপমান সে কিছুতেই সইবে না। মেয়ে যে-রকম আশ্চর্য্য জেদী, না জানি কি করে বসে! আজকাল যে-রকম দিনকাল! সত্যিই, যেমন করে হোক আস্‌চে মাঘফাল্গুনের মধ্যে একটা কিছু করে ফেল্‌তে হবে।

কি একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় ত্রৈলোক্যনাথ শিউরে উঠ্‌লেন। বালাপোষখানা মুড়ি দিয়ে বৃদ্ধ হাতের কাছের গাড়ু গামছা ফেলে রেখেই অন্যমনে আমতলার রাঙা রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লেন।

(২)

অরুণকুমারের বন্ধুর বাড়ী সেই গ্রামে। বড়-দিনের ছুটিতে সে কলেজের বইখাতাগুলোকে একটু বিশ্রাম দিয়ে দু-চারদিনের জন্যে বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে এসেছে। শহরে ছাত্রমহলে তার বেশ নামডাক। ছাত্রসভায় যেদিন তর্কযুদ্ধে সে একপক্ষের মহারথী হয়ে দাঁড়ায় সেদিন তার বাক্যজালের ঘনঘটায় অপর পক্ষের দৃষ্টি

কিছুতেই ছিদ্র খুঁজে বার কর্‌তে পারে না। স্বপক্ষের দল মহা আনন্দে তার আড়াল থেকে মেঘনাদের মত দুটোচারটে শক্ত-শক্ত অস্ত্র প্রয়োগ করে তর্ক শেষে হল্ কাঁপিয়ে কলরব কর্‌তে-কর্‌তে বিপক্ষদের শুক্‌নো মুখের দিকে সগৌরবে কটাক্ষ-পাত করে বড়রাস্তার উপরের কোনো পরিচিত হোটেলে গিয়ে দ্বিতীয় আর-একটা সভা জম্‌কিয়ে বসে। এ সভায় মুখের কাজ দুইভাবেই চলে। কথার অবকাশে যেটুকু সময় পাওয়া যায় টেবিলের উপর সাজানো গরম-গরম সুখাদ্য তা' তখনি পূর্ণ করে তোলে। অরুণের ভাষার, যুক্তির, ভাবের ও সাহসের প্রশংসা বন্ধুরা যেখানে কথায় মনের মত প্রকাশ করে উঠ্‌তে না পারে, সেখানে পরস্পরের পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে আর হাসির ফোয়ারা তুলেই সেটা সেরে নেয়। অরুণের বুক তখন দশহাত ফুলে ওঠে। সাময়িক বড়-বড় আন্দোলনে প্রতিজ্ঞাপত্রে নামস্বাক্ষর কর্‌বার পালা এলে আর-সকলে যখন পিছনে হাঁটে অরুণ তখন চট্ করে উঠে পড়ে সবার আগেই দস্তখতটা করে আসে। মাঝে-মাঝে যুবকবন্ধুদের ভীরুতার জন্যে দুস্মোচারটে

কড়া কথাও যে শুনিয়ে দেয় না তা নয়। এ ছাড়া অরুণের আর-একটা গুণও ছিল। সে আধুনিক সাহিত্য ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে খুব টাট্‌কা রকমের অনেক খবর রাখ্‌ত। তার মত সমঝদার লোক খুঁজ্‌লে দুটোচারটেও মেলে কি না সন্দেহ। নিজে যে সে বড় কিছু সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল কি সামাজিক সমস্যা পূরণের চেষ্টা করেছিল তা নয়; তবে নব্যতম যুগে যে যেখানে যা-কিছু নূতন কথা বলেছে সে-সবের খবর রয়টারের তারের আগেই অরুণের কাছে এসে পৌঁছত। তরুণ অরুণের মতই আমাদের অরুণ প্রথমে তাঁর বন্ধুমহল নূতন খবরের আলোকে উদ্ভাসিত কর্‌তেন। তার একটা বড় দুঃখ ছিল যে এত-রকম বিষয়ের উপর টান থাকা সত্ত্বেও হাতেকলমে সে আজ অবধি কিছুই করে উঠ্‌তে পারে নি। তার যা কিছু কীর্ত্তি সবই কল্পনালোকের স্বপ্নপুরীতে হাওয়া খেয়ে নধর সুন্দর হয়ে উঠ্‌ছে, বড় জোর মাঝে মাঝে মা সরস্বতীর কাঁধে ভর দিয়ে ছাত্রসভায় বিদ্যুৎলতার মত একবার চকিতের দেখা দিয়ে যায়; কিন্তু মর্ত্ত্যলোকের কঠিন মাটির উপর সূর্য্যের তীক্ষ্ণ আলোকের সাম্‌নে আজও তারা কোনো

চিহ্ন রেখে যেতে পারে নি। তাই শুধু থিওরির মহাপুরুষ অরুণের মনে একটা বড়-রকম বেদনা অহর্নিশি খোঁচা দিয়ে-দিয়ে তাকে উত্যক্ত করে তুলেছে। সে ইতিমধ্যেই টের পেয়েছে বই লিখে যশ পাওয়া তার পক্ষে শক্ত; কেননা তার মত মূর্ত্তিমান যৌবনের পক্ষে স্থির ধীর বৃদ্ধের মত বসে বসে দশ পাতা লেখা অসম্ভব, তা যতই কেন না তার বচন-বিন্যাসের মধ্যে ভাবরসের প্রাচুর্য্য আর ভাষার ছটা থাকুক। আর সমাজতত্ত্বসম্বন্ধে কোনো গবেষণা করা ত আরোই কঠিন; কারণ বড় বড় পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে নিতান্ত চুনোপুঁটি পর্য্যন্ত যতলোকের বই সে পড়েছে সবগুলোই বেশ জলের মত সে বুঝেছে এবং সভাসমিতিতে সেসব কথা অনেক বারই উদ্গার করেছে, কিন্তু তার উপরে নূতন কিছু বল্‌বার ত সে খুঁজে পায় না। সব কথাই ত তারা একটানে বলে শেষ করে দিয়েছে। কাজেই কর্‌বার মধ্যে বাকি থাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিম্বা সৎসাহসের কাজ। তা' এটা বোধ হয় সকলেই অনায়াসে বুঝ্‌বেন যে মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব যার ব্যবসা, সে কি আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে প্রাণহীন কলকব্জা

নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে? কাজেই অরুণ স্থির করেছিল বিনাপণে দরিদ্রের কন্যা গ্রহণ কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু একটা সোজাসুজি উপায়ে নিজের অসাধারণত্ব প্রকাশ করবে। এতে খুব বেশী বিদ্যাবুদ্ধি কি পাণ্ডিত্য কোনোটারই দরকার হবে না। ভগবান দয়া করে তাঁকে যে পুরুষ-জন্ম দিয়েছেন, এ ক্ষেত্রে বিজয়গৌরব শুধু সেই আজন্ম-লব্ধ পৌরুষেই অনায়াসে লাভ করা যাবে। অক্লেশে এই যে মহাকীর্ত্তি স্থাপন সে করবে, বিশ্বের দরজায় দুন্দুভি বাজিয়ে কোনো হিতৈষী বন্ধু যদি সেটা প্রচার নাই করে দেয় তবে সেটাও না হয় অরুণ স্বয়ং একটা ছদ্মনামে খবরের কাগজের পাতায়-পাতায় তুলে বিশ্ববাসীর ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেবে। কিন্তু বেচারা অরুণ এই যে এত বড় ত্যাগস্বীকারটা করবে তার বিনিময়ে কি কেবল খবরের কাগজের রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শহীন ফাঁকা বাহবাটুকুই সে পাবে? অন্ততঃ জয়মাল্যটা রূপসী ষোড়শীর পদ্মহস্তে তার কণ্ঠে এসে যদি না পড়ে তবে ত সবই বৃথা। তার অন্তরের সৌন্দর্য্য-পিয়াসী তরুণ প্রাণটি এটুকু দাবী ছেড়ে দিতে পারছিল না। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের

ছাপের জোরে সে ত মুখের একটা কথা ফেল্‌লেই সোনায় রূপায় মোড়া একটি পত্নী এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চিরদিনের মোটামুটি খোরাকপোষাকটা পেয়ে যেতে পারে। এমন কি ও-ছাপটুকু না থাক্‌লেও কোন্ কম-সম দু-চার-হাজার সে না পেত? তাই যখন সে মানসচক্ষে তার অদূর ভবিষ্যতের বিবাহ-বাসর কল্পনা করে তখন সেই তরুণী বধূর অঙ্গে অঙ্গে স্বর্ণ-আভরণ ঝিলিক্ দিয়ে না উঠ্‌লেও তার লজ্জারুণ মুখ আর ক্ষীণ দেহলতার অপূর্ব্ব সুষমাতেই সভা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মনের মধ্যে ঐ লোভটুকু গোপন রেখে দরিদ্রকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার কর্‌বার ইচ্ছায় তার এই বয়সেই অরুণ অন্ততঃ বার দশেক কনে দেখ্‌তে গিয়েছে। কিন্তু বিধি এম্‌নি বাম যে খোঁপায় জরি-মোড়া নোলক-নাকে বিবাহবাজারের এই সুলভ পণ্যগুলির মধ্যে সে আজও তার কল্পনালোকের মানসী বধূর একটুখানি আভাস পায়নি। এদের কারো মধ্যে যদি বা একটু খানি সহজ শ্রী উঁকি দিতে দেখা যায়, তাও প্রসাধনের কঠিন শাসনে আধমরা হয়ে আছে। অগত্যা অরুণকে হতাশ মনে

কোনো একটা বাজে ছুতা দেখিয়ে দশ-দশবারই ফিরতে হয়েছে। বন্ধুমহলে ঠাট্টাতামাসার ধূয়া উঠলে সে মুখ উঁচু করে বলত, "আরে দূর, ওসব ফন্দি-বাজের বাড়ী আবার বিয়ে করে, টাকার ঘড়া মাটিতে পুঁতে গরীব সাজবার চেষ্টা। আমি যার মেয়ে বিয়ে করব সে আমার মত সোজাসুজি নির্ভীক হবে, তবে না। আর মেয়েটাও নেহাৎ অমন ছিঁচ্‌কাঁদুনে ধাঁচের হলে আমার জীবনটাই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

এম্‌নি করে অরুণের খ্যাতিলাভের দিনটা ক্রমেই ভবিষ্যতের ছায়ালোকে মিলিয়ে যেতে লাগল। এমন সময় নিতান্ত নিরাশ হয়ে সে এক-দিন বন্ধুমহলের আদর-অভ্যর্থনা ঠাট্টাতামাসা এবং শহরের নানা উত্তেজনা ছেড়ে তার অমন অবসরহীন জীবনেও একটা ছোটখাট অবসর করে নিয়ে পাড়া-গাঁয়ের শান্তশ্রীতে মনটা একটু জুড়িয়ে নিতে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বিধি যে কার উপর কখন কেমন ভাবে সদয় হয়ে ওঠেন তা' ত বলা যায় না।

(৩)

বাঙালী পাড়ায় হঠাৎ একটি পাত্রনামক জীব যদি নূতন দেখা দেন তা' হলে পাড়ার এ-মোড় থেকে

ও-মোড়ের মধ্যে তার খবর প্রচার হতে দু দশ মিনিটই বোধ হয় যথেষ্ট হয়। বিশেষ তিনি যদি যোগ্যপাত্র হন তবে ত কথাই নেই।

ত্রৈলোক্যনাথ সংসারে চেনেন শুধু নিজের বইগুলি আর অলকমণি। গিন্নি যে কখন্ কিসের জন্যে তাঁর উপর খড়গহস্ত হন আর কেনই বা অকস্মাৎ হাসিমুখে পুরাতন প্রেম জাগিয়ে তুলে সেকালের মত মান-অভিমানের পালা স্থরু করেন তা বুঝে ওঠা তাঁর পক্ষে একান্ত কষ্টকর। তাই তিনি সরস্বতীর সেবা করে আর অলকার সেবা পেয়ে হৃদয়ে ঘরেই দিন কাটান। কেবল মাঝে-মাঝে গৃহিণী যখন কথার ঘায়ে চেতনা দিয়ে বুঝিয়ে দেন যে অলকার সত্যিকারের বয়স অনেক বছর আগেই তেরোর কোঠা পার হয়ে গেছে তখন ভদ্র-লোককে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বিশুবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে পাত্রের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়। দিনকতক অনেক খোঁজাখুঁজি করে যাকে পাওয়া যায় কন্যা তাকেই দেখানো হয় বটে এবং তাঁদেরও মেয়ে পছন্দ হয়, কিন্তু মেয়ের বাপের শীর্ণদেহ আর শূন্যমুষ্টিটা কোনোমতেই তাঁরা বরদাস্ত করে

যেতে পারেন না। অগত্যা ঘরের মেয়ে ঘরে রেখে তাঁদের বিদায় করে দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ আবার ঘরের মধ্যে অঁচল আসন গ্রহণ করেন।

তাই সেদিন শীতের সকালে ম্লান মুখে আমতলার পথ দিয়ে যেতে যেতে ভট্‌চায্যি মশায়ের মুখে নবাগত পাত্রটির রূপগুণ বর্ণনা শুনে ত্রৈলোক্যনাথ যখন হঠাৎ প্রশ্ন করে বস্‌লেন, "কোন্ ছেলেটি হে ?" তখন দীর্ঘ শিখা দুলিয়ে ভট্টাচার্য্য বল্‌লেন, "রামঃ ! মেয়ের বাপ হয়েছ কি কর্‌তে ? পা বাড়ালেই যে হরিষখুড়োর বাড়ী এসে পড়ে ; সেখানে আজ তিন দিন ধরে অমন সাগর-ছেঁচা মাণিকের মত ছেলেটা এসে রয়েছে আর তুমি কোন্ মুল্লুকে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিলে হে ? আবার শুনেছি নাকি ছেলেটা কোথায় সভাসমিতি করে লেখাপড়া করে দিয়েছে যে বিয়ে করে টাকা নেবে না। এই বেলা গিয়ে গলায় গাম্‌ছা দিয়ে হাতে পায়ে ধরে পড়, এ যাত্রা উদ্ধার হয়ে যাবে, মেয়েটাও সৎপাত্রে পড়্‌বে।"

ত্রৈলোক্যনাথ গলায় গাম্‌ছা দিয়েছিলেন কি না ঠিক বলা যায় না, তবে অরুণ এই নিয়ে একাদশ

বার কনে দেখ্‌তে বেরিয়ে পড়্‌ল। ত্রৈলোক্যনাথ এবার সত্যিসত্যিই বুঝেছিলেন যে প্রত্যেকটি দিনের সঙ্গে মেয়ের বয়স বাড়্‌তে থাক্‌বে এবং তাই নিয়ে তার সাম্‌নেই নিত্যনূতন পালার অভিনয় হবে, কাজেই তিনি আদরিণী অলকমণির মানরক্ষার জন্য আজই কন্যা দেখাবার প্রস্তাব করে বসেছিলেন। অপরিচিত বৃদ্ধের এই প্রস্তাবে অরুণও বিশেষ কিছু আপত্তি কর্‌লে না; সেও বোধ হয় ভেবেছিল অজানা মুল্লুকেই একবার ভাগ্যপরীক্ষা করে দেখা যাক না। রোমাণ্টিক-রকম কিছু একটা ঘটে যেতেও ত পারে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় মেয়ে দেখানো হবে। মেয়ের মা খবর শুনে আহ্লাদে আটখানা। সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর দুঃখ উথ্‌লে উঠ্‌ল, যদি টাকা থাক্‌ত তবে বিয়েতে মেয়েকে জমিদারের মেয়ে বিধুর মত হালফ্যাশনের পুষ্পহার আর আটগাছা বসন্তবাহার চুড়ি গড়িয়ে দিতেন; তা কপালে ত আর অত সুখ লেখা নেই, যাক দুগাছা আঙুরপাতা ফারফোর ফাঁপা বালা গড়িয়ে দিলেই হবে। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে গৃহিণী বাইরের ঘরের কুলুঙ্গির ছেঁড়া-মলাট-

দেওয়া আবর্জ্জনাগুলো একটানে বিদায় করে দিয়ে, কর্ত্তার তক্তপোষের ছেঁড়া তোষকখানার উপর নিজের গায়ের পুরাণো শালখানা ঢাকা দিয়ে, ঘরখানাকে একটু ভদ্র কর্‌বার চেষ্টায় লেগে গেলেন। ঘরদোর-গোছানো, খাবার-করা হতে না-হতে অরুণ এসে উপস্থিত।

মা ডাক্‌লেন, "আয় মা অলক, তোর চুল কগাছা বেঁধে দি। সন্ধ্যে হয়ে এল, গা ধুয়ে নীলাম্বরী কাপড়খানা পরে আয়।"

মা জান্‌তেন, কেউ দেখ্‌তে এসেছে বল্‌লে মেয়ে কখনই সাজসজ্জা করতে রাজি হবে না, তাই সত্যিকারের খবরটা মেয়ের জানা থাক্‌লেও মিথ্যা কথা বলেই তার প্রসাধন করে দিতে হয়। আজ কিন্তু অলকা বলে বস্‌ল, "না মা, আমার এখন চুল বাঁধ্‌তে ভাল লাগ্‌ছে না। আমার মাথা ধরেছে।"

মা মনে মনে ভাব্‌লেন—থাক্, আমার মায়ের অমনি রূপেই জগৎ ভুলে যাবে। তবে কপাল ঢেকে চুলটা বেঁধে দিলে মস্ত কপালটা আর খাঁড়ার মত নাকটা একটু কম দেখাত। যাক, ভাগ্যে থাকে ত এইতেই হবে। টাকার জোর থাক্‌লে কি

আর কিছু ভাব্‌তাম। মেয়ে এতদিনে কবে রাজরাণী হয়ে মোতির মালা গলায় দিয়ে সোনার খাটে পা ঝুলিয়ে দিন কাটাত।

বৈঠকখানা-ঘর থেকে ডাক এল, "মা অলক, পান নিয়ে এস দেখি মা।"

ঘরের ভিতর অরুণ তখন সুখস্বপ্নে বিভোর। একটি শ্যামাভ উজ্জ্বল মসৃণ মুখ আর একজোড়া ডাগর সলজ্জ চক্ষু আবছায়াভাবে কেবলি তার মনের মধ্যে ফুটে উঠ্‌ছে। মেয়েটি একহাতে নীলাম্বরীর একটুখানি কোণ মুখের কাছে টেনে ধরে ঘাড় হেঁট করে আর-এক হাতে পানের ডিবেটা তার কাছে এগিয়ে দিচ্ছে। প্রথম প্রণয় সঞ্চারের গোপন পুলকের স্পর্শ ও প্রথম দর্শনের লজ্জার মধুর মিশ্রণে তার তরুণ কোমল মুখখানি রক্তাভ হয়ে উঠেছে, মাধুরী যেন ফেটে পড়্‌তে চায়। পায়ের মলের মৃদু শব্দ সেই রূপমাধুরীর সঙ্গে একটুখানি মোহন সুরের আমেজ দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ অরুণের এই স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে ফেলে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে অলকা এসে দাঁড়াল। অলঙ্কারের মধুর নিক্কণ কি মাথাঘসার স্নিগ্ধ গন্ধ তার আগমনী

ঘোষণা করেনি। দেবতার অকস্মাৎ আবির্ভাবের মত সে হঠাৎ উদয় হয়ে স্বপ্নবিভোর অরুণকে সচকিত করে তুল্‌লে। অরুণের দিকে পাশ ফিরে পানের ডিবেটা তার বাবার হাতে তুলে দিয়ে সে এমনভাবে ফিরে দাঁড়াল যেন শুধু ডিবেটা দেবার জন্যই তাকে নেহাৎ একবার এসে পড়্‌তে হয়েছে। ঘরে যে আর-একজন নবাগত তৃতীয় প্রাণী রয়েছে সেটা অলকার চোখে পড়েও যেন পড়েনি। এই নূতন প্রাণীটির আগমনের সঙ্গে যে বিশেষ করে তারই একটা সম্পর্ক আছে সেটা মনে করে তার মনে তরুণ-স্বভাবসুলভ যে লজ্জা আসন বিস্তার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিল্, তার এই স্পর্দ্ধায় অলকা আরও লজ্জিত হয়ে উঠ্‌ছিল। এই দরিদ্রের মেয়েটির গৌরব কি অহঙ্কার কর্‌বার কোনো কিছুই প্রায় ছিল না, কিন্তু তার তেজস্বী মনটি পরাভবকে কিছুতেই স্বীকার কর্‌তে পার্‌ত না। এমন কি লোকের চোখের কুতুহলী দৃষ্টি যে তার বাহিরের আবরণ ভেদ করে অন্তরের দৈন্য কি দুঃখের দিকে একটু কটাক্ষ কর্‌বে তাও তার অসহ্য ছিল। তাই সে নিজের স্বাভাবিক লজ্জাতেও

লজ্জিত হয়ে শক্ত সারথির মত উচ্ছ্বসিত লজ্জার রাশ টেনে ধরে রেখেছিল। জোর করেই সে মাথাটা খাড়া করে রেখে সশব্দে চাবির গোছা পিঠের উপর ফেলে ঘর থেকে বাহিরে যাবার উপক্রম করতেই ত্রৈলোক্যনাথ বল্লেন, "অলকা, "অরুণবাবুকেও না হয় তুমিই পানটা দাও।"

অলকা দৃপ্ত ভঙ্গিমায় ঘাড় ফিরিয়ে অরুণের হাতের কাছে পানের ডিবেটা এগিয়ে ধরলে। প্রসাদদাত্রী দেবীর মত সে অকম্পিত হস্তে অরুণের হাতের প্রায় উপরেই পানের ডিবেটা তুলে দিলে; কৃপাভিক্ষুর মত, দেবীর করস্পর্শে, অরুণেরই হাত কেঁপে উঠ্ল। কৃপাভিখারিণী হলেও অলকা যে মহিমাময়ীর মত অরুণের এত ঊর্দ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তাতে অরুণের মনটা আপনি যেন কেমন নত হয়ে পড়ল। অগ্নিবরণা অলকার নিরাভরণ হাতের লাল কাঁচের চুড়ি দুটিই আজ তার চোখে পদ্মরাগ মণির মত জ্বলে উঠ্ল। মনে মনে এতদিন সে যে কুসুমকোমলা আনতমুখী কিশোরীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের আশার পথ চেয়ে ছিল,—অলকার প্রশস্ত কপাল, খাঁড়ার মত নাক, আর আগুনের মত জ্বলজ্বলে রং

তার কাছ দিয়েও ঘেঁসে না। অরুণের প্রতি অনুরাগ কি বিরাগ, বিবাহকল্পনায় লজ্জা কি ভয়ের লেশ সে-মুখে কোথাও একটু ছায়া ফেল্‌তে পারেনি। আগুন যেমন বিশ্বগ্রাস করেও সেই এক রক্তমূর্ত্তিতে বিরাজ করে, কোনো পরিবর্ত্তনের দাগও তার গায়ে পড়ে না, তেমনি এই মেয়েটির মনে সুখ দুঃখ লজ্জা ভয় আনন্দ কি নিরানন্দ যারই স্রোত বয়ে থাকুক না কেন বাইরে তার কোনো প্রকাশই হয়নি। কিন্তু কেন জানিনা এই মেয়েটিই আজকার মত অকস্মাৎ অরুণের হৃদয় জুড়ে বস্‌ল। তার কল্পনার কিশোরীর রূপ কোথায় মিলিয়ে গেল; একটি আঙুলও না হেলিয়ে রাজলক্ষ্মীর মত এই তরুণী সে সিংহাসন আলো করে আপনার দখল জানিয়ে দিলে।

অরুণের ভাবুক মন ভেবে কোনো কাজ কখনও করে না। ভাবের প্রবাহ যখন তাকে যেদিকে ঠেলে নিয়ে যায়, নিশ্চিন্ত মনে মহানন্দে সে তখন সেইদিকেই ভেসে চলে যায়। নিজের মনকে সে কখনও কোনো কাজে বিশেষ বাধা দেয়নি। এই অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র গৃহস্থের বয়স্থা কুমারীটি যেই

তার মনে একটা তরঙ্গ তুলে দিয়ে সগর্ব্বে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল, অম্‌নি সে বলে উঠ্‌ল, "তবে আর কি! আমার ত কোনো আপত্তির কারণ দেখ্‌ছি না, আপনি যা মনে কর্‌বেন তাই হবে।" তখনও অলকার আঁচলের কোণটা দরজার আড়ালে মিলিয়ে যায়নি, এরি মধ্যে বিবাহ স্থির হয়ে গেল। খবরটা বোধ হয় সে শুনেই গিয়েছিল।

আনন্দের সঙ্গে-সঙ্গে অরুণের মনে গর্ব্বও কম হয়নি। সে শুনেছিল,—অলকা আজ যে লাল কাঁচের চুড়ি আর কালাপেড়ে শাড়ী পরে দেখা দিতে এসেছিল, বধূবেশে তার সজ্জা এর চেয়ে বড় বেশী হবে না। বড়জোর শাড়ীখানার রং লাল হবে এবং যে সোনারূপাটুকু না হলে মেয়ের বিবাহ হয় না, সেইটুকুর স্পর্শ তার সঙ্গে থাক্‌বে। সভায় বরাভরণ কি দানসামগ্রীর ঘটাও যে খুব হবে এমন কথা এই জীর্ণ কুটিরখানির অধিবাসীদের দেখে মনে করা পক্ষীরাজ-ঘোড়ায়-বহা কল্পনার রথে চড়ে এলেও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অরুণ ভাব্‌ছিল—এতদিনে আমি একটা কীর্ত্তি স্থাপন কর্‌তে চল্‌লাম। দরিদ্রের অরক্ষণীয়া কন্যাটিকে এক কথায়

উদ্ধার করে দিচ্ছি, একি কম কথা! ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্যে ভগবান যে এদের হাতে এককণা দেননি, সে আমার পরম ভাগ্য। কারণ, আমি না চাইলেও যার আছে সে তার মেয়েকে শূন্যহাতে পরের বাড়ী পাঠাত না। কিন্তু কন্যার হাত যত পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ত, আমার যশের জয়ধ্বজা সোনার ভারে ততই ধূলায় লুটিয়ে পড়্‌ত। আজ সে বাধাহীন আনন্দে আকাশে মাথা তুলে উড়্‌তে পার্‌বে।

অলকার অতলস্পর্শ মনের মধ্যে সেদিন বেশ তোলাপাড়া লেগে গিয়েছিল। বিবাহ যে শুধুই সানাই বাঁশি শাঁখ আর ফুলের মালার মেলা নয়, শ্বশুরবাড়ী যে নিছক মেয়ে কাঁদাবার একটা কল নয়, একথা বোঝ্‌বার বয়স তার যথেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু নবযৌবনের বাসন্তী রঙে তখন তার কল্পনা উজ্জ্বল। বালিকার পিতৃগৃহমুখ মন এখন আর তার নয় বটে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে পরগৃহের নানা দায়িত্ব ভাবনা ও বিভীষিকাও তার মনে প্রবেশ লাভ করেনি। মানুষ যে বহুরূপী, তার মন যে নদীর জলের স্রোতের মত কত বাঁকে বাঁকে ঘুরে চলে সেসব কথা আজও অলকার অজানা। আজ মুহূর্ত্তের

জন্যে যে মানুষটিকে সে দেখেছিল, যার কথা সে আড়াল থেকে একটিবার মাত্র শুনেছিল, তার সহৃদয়তায় অলকার মন তখন পরিপূর্ণ। অলকার মনে হচ্ছিল,—এই মানুষটি যেন তার আজন্ম পরিচিত, তার রূপগুণের যেন তুলনা হয় না। এই-টুকুতেই যে মানুষের সমস্ত পরিচয় হ'য়ে যায় না সে কথা অলকা আজ ভুলে গিয়েছিল ; যাকে আজ সে বরণ করতে দাঁড়িয়েছে, তার রূপও যে অলকারই মনের রঙে রাঙা তাও সে আজ বোঝেনি।

অরুণের প্রতি অলকার মন সম্ভ্রমে মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হলেও সেই সঙ্গে তার মধ্যে একটা গোপন ব্যথা তাকে অনুক্ষণ পীড়া দিচ্ছিল। যার কাছে আজ সে একবার মাথাও নোয়ায়নি, এমন কি পাছে কোনো মনের কথা ধরা পড়ে এই ভয়ে যার দিকে সে ভাল করে একবার তাকায়ওনি, সেই নিতান্ত পরের কাছেই হয়ত পিতা দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে করুণা ভিক্ষা চেয়েছেন। হয়ত সেই কাতর ভিক্ষার বলেই আজ তার এ সৌভাগ্য ! ছি, ছি, ছি ! লজ্জায় অলকার মাথা হেঁট হয়ে আস্‌ছিল, অপমানে দুঃখে ক্ষোভে তার রাঙা মুখ ফেটে যেন আগুন ঠিক্‌রে

পড়ছিল। তার পিতা কন্যার বিবাহ ক্রয় কর্‌বার উপযুক্ত মূল্য দিতে অক্ষম! এই কথা আজ আনন্দের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাঁকে বলে যাচ্ছিল,—অরুণের গৃহে তোমার অধিকার নেই। অরুণ মহৎ বটে, কিন্তু তোমার দেনা পরিশোধ না করে কোন্ মুখে তুমি সে মহতের গলায় চিরপ্রেমের মালা দেবে? শুধু প্রেমে হবে না, মূল্য চাই যে।

অলকা দরিদ্রের মেয়ে বলেই বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত নিঃসঙ্কোচে কারো ভালবাসার উপহারও গ্রহণ কর্‌তে পারেনি। তার মনে হত করুণা যেন ভালবাসার ওড়না পরে তার সঙ্গে ছলনা কর্‌তে এসেছে। এমন কি যে-সইকে সে আজন্ম প্রাণ দিয়ে ভালবেসে এসেছে সেই সই যেবার সই-পাতানোর উপলক্ষ্য করে তাকে আঁচ্‌লাদার ঢাকাই কাপড় দিয়েছিল, সেবার ভাব্‌নায় তিন রাত্রি তার ঘুম হয়নি। কেবলি মনে হত বিজয়ার দিন সই বোধ হয় তার পুরানো ঢাকাই-পাড়-বসানো নয়ন-সুকের শাড়ীর ছলটা ধরে ফেলেছে, তাই এই দয়া! নিজের হাতে শিউলি ফুলের রং করে সেই কাপড়-খানারই একটু চেহারা ফিরিয়ে সইকে ফেরত

দিয়ে তবে সে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল। দেবার সময় বলেছিল, "সই এ কাপড়খানা প্রায় তোমার খানারই মতন, কেবল সুন্দর দেখাবে বলে আমি যা একটু রং করে দিয়েছি।"

(৪)

ত্রৈলোক্যনাথের অলকমণির বিবাহ। মায়ের এত সাধের পুষ্পহার কি বসন্তবাহার চুড়ি কিছুই গড়ানো হল না। এমন কি চিড়িতন-চুড়ি কি আঙুরপাতা বালাও জুটল না। জমিদার-কন্যা বিধুর সভা-উজ্জ্বল-করা গহনার বাহার আজ তাঁকে কেবলি উন্মনা করে তুলছিল। ওই মেয়ের গায়ে অত হীরে মোতির ছটা, আর আমার সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীর মত মেয়ের গায়ে ক্ষিনা সোনার আঁচড়টুকুও পড়ল না। অলকার গহনা হল—আটগাছা ডায়মণ্ড কাটা রূপোর মল, আর একজোড়া হাল্কারকম ইহুদি মাকড়ী। হাতে চারগাছা দিল্লীদরবার কাঁচেরচুড়ির সঙ্গে একজোড়া শাঁখা পরিয়েই কনের অলঙ্কার শেষ হয়ে গেল। কোথায় রইল মোতির মালা, কোথায়ই বা হীরার বালা! এঁরা শুনেছিলেন অরুণের

বাবা খুব মস্ত বড়লোক, লাখপতি বল্লেই হয়। অরুণ কিন্তু এখন সেখানে খবর দিতে কিছুতেই রাজি হল না। একেবারে জয়শ্রী ও জয়মাল্য সঙ্গে করে বিজয়গৌরবে সে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে। সকলকে এমন একটা চমক দেবে যা আর কেউ কখনও দেয়নি! আগে থেকে এমন কীর্ত্তিটা সে ফাঁস করতে চায় না। তাই আজ একমাস হল সেখানে সে বিশেষ কোনো খবর দেয় না। কেবল মাসের গোড়ায় একবার জানিয়ে রেখেছিল যে সে কিছু-দিনের মত দেশভ্রমণে বেরিয়েছে।

হাতে টাকা নেই, কাজেই অরুণ নিজেও কিছু দিতে পারেনি। তবে, শাশুড়ী জামাই দুজনেরই আশা ছিল অমন রূপের বউ পেলে শ্বশুর কোন্ পাঁচ দশ হাজার টাকার গয়না না দেবেন।

ছোট উঠানে জন পঞ্চাশ-ষাট লোকের মাঝখানে গোটাদশেক আলো জ্বেলে কোনো-রকমে অলকার বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েরা সানাই বসাতে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু টাকা কে দেবে? তাই ঘন ঘন উলু দিয়ে আর জোড়া শাঁখ বাজিয়েই সে সাধটুকু মেটাতে হল।

অরুণের মনটা আজ কেমন যেন একটু খুঁৎখুঁৎ কর্‌ছিল। শীতের সন্ধ্যায় একে দেশটাই কেমন ম্লান, গাছপালাগুলো নিঃঝুম, বেরালকুকুরগুলো জড়সড় হয়ে কোণে-কোণে পড়ে আছে, মানুষের চেহারাও এখন কেমন যেন ফাটা চটা। তার উপর আলো সানাই লোকলস্কর কিছুরই সমারোহ নেই, বিয়ে বলে মনে হয় কি করে? বড়লোকের ছেলে কল্পনায় দরিদ্রের বিবাহটা যেমন করে এঁকেছিল, দেখ্‌লে বাস্তব তার চেয়ে ঢের বেশী ম্লান বিষণ্ণ। ভাব্‌ত কনের গায়ে গয়না না থাক্‌লেও পুষ্প-আভরণের অভাব হবে না। সানাই না বাজ্‌লেও বাসর আলোয় উজ্জ্বল সুন্দর হয়ে থাক্‌বে। গালিচা না থাক্‌লেও পদ্মহস্তের নিপুণ আল্‌পনায় স্নিগ্ধ দেখাবে। কিন্তু গরীবের বাড়ী অত করে কে? একা মাকে কোনো-রকমে একটু পিঁড়ির উপর আল্‌পনা দিয়ে আবার তখনি অন্য কাজে ছুটতে হচ্ছে। সব দিক থেকে দারিদ্র্য আজ ফেটে বেরিয়ে পড়্‌তে চায়।

অরুণ আজ নিজেও তাই একটু ম্লান মুখেই বিবাহ-সভায় এসেছিল। শুভদৃষ্টি মাল্যদান সব

হয়ে গেল; অরুণের মন খুব যে খুসী হয়ে উঠ্‌ল তা মনে হল না।

কিন্তু সকালের চোখের আড়ালে সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের অবসানে যখন অলকার সঙ্গে তার প্রথম দেখা হল, তখন তার চোখের সম্ভ্রমপূর্ণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অরুণের মন আবার যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। আজ প্রায় একমাস হল অরুণের সঙ্গে অলকার বিয়ের কথা হয়েছে, পাড়াগাঁয়ের ঘাটে পথে নির্জ্জনে দেখাও হয়েছে, কিন্তু অলকা একদিনও ত তার দিকে ভাল করে চায়নি, কথা বলা ত দূরে থাক! যদি বা কখনও চেয়েছে তাও নেহাৎ পথের পথিক পথিককে চেয়ে দেখার মত। আজ প্রথম তাকে নিতান্ত আপনার জেনে সে তার কৃতজ্ঞতার উৎস চোখের দৃষ্টিতে ভরে এনেছিল। অন্যের সাম্‌নে তার সে অসীম কৃতজ্ঞতা সে জানাতে চায় নি। শুভদৃষ্টির দৃষ্টি তার একেবারেই নিরর্থক শূন্যদৃষ্টি। দরিদ্রার প্রেম কি কৃতজ্ঞতা সভার সাম্‌নে কেন সে স্বীকার কর্‌বে? উদাসিনী তেজস্বিনী অলকা তাই আজ একমাস পরে আপনার জেনে নিজের অনধিকারের দাবীর কথা ভুলে গিয়ে

কল্যাণী বধূর বেশে স্বামীর পায়ে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি নিয়ে এসেছে। অরুণের বিমুখ মন তাই দেখে ক্রমে প্রসন্ন হয়ে এল।

(৫)

দিন সাতেক শ্বশুরবাড়ীতে কাটিয়ে অরুণ মহা ফাঁপরে পড়ল—কি করে হঠাৎ বউ নিয়ে বাড়ী গিয়ে হাজির হবে? অথচ এখন না গেলেও নয়, বিয়ে যখন করেছে তখন নিয়ে একদিন যেতেই হবে। কিন্তু যে বেচারা এত কাল কেবল কথার ব্যবসা করে' কথায় কথায় বিশ্বসংসার ছেয়ে বেড়িয়েছে, সত্যি কাজ করবার শক্তি তার বড় বেশী বাকি ছিল না! এমন কি একটা উপায় ভেবে বের করবার মত মস্তিষ্কের জোরও তার ছিল কি না সন্দেহ। তার মনে হচ্ছিল,—এই সাতটা দিন যেমন পরিপূর্ণ আনন্দে কেটেছে, তেমনি নিশ্চিন্তে নিছক আনন্দ-সুধায় জীবনটা যদি ভরে থাকত, যদি কোনো ভাবনা কোনো চিন্তা না থাকত, তবে সে তার চির-আকাঙ্ক্ষার ধন যশোগীতির বাসনাও তুচ্ছ বলে ভাসিয়ে দিতে পারত।

কিন্তু সে ত হবার নয়। এ বিশ্বে নিরালায়

লুকিয়ে আনন্দ সম্ভোগ কর্‌বার জায়গা কোথাও মিল্‌বে না।

অলকার সঙ্গে মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা ছেড়ে, ওই পাষাণপ্রতিমার অন্তরের সুধানির্ঝরে শুধু ক্ষণিকের মত স্নান করে, তাকে উপায়ের সন্ধানে একদিন কলিকাতা যাত্রা কর্‌তে হল। যাবার সময় সে প্রতিজ্ঞা করে গেল—অলকাকে রোজ একখানা করে চিঠি লিখ্‌বে।

সত্যিই প্রতিদিন সকাল বেলা স্নান-আহারের আগে অলকার নামে একখানা করে চিঠি আস্‌ত। সে সময়টা তার এত স্থির জানা ছিল যে একদিনও বোধ হয় ডাক হর্‌করাকে ডেকে চিঠি দিতে হয়নি। কোনো-না-কোনো কাজের ছলে অলকা ঠিক সেই সময়টা বাইরের ঘরে গিয়ে হাজির হত। তার দুর্ভাগ্যের যত কিছু নিদর্শন সে সমস্তই সে এত দিন ধরে লোকের চোখের আড়াল করে রাখ্‌তে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে; কিন্তু আজ পরিপূর্ণ সৌভাগ্যের দিনেও,—কোনো মানুষ যে তাকে অতখানি ভালবাসে—সে সৌভাগ্যের কথা সে লোককে জানতে দিতে চায় না। রোজ যে তার

চিঠি আসে এবং তার জন্য যে সে এতখানি ব্যগ্র এ কথা তার বাড়ীর লোকেও জান্‌ত কি না সন্দেহ। এমন কি যে পিয়ন নিত্য সেই আনন্দের বার্ত্তা বহন করে আন্‌ত, সেও বোধ হয় অলকার প্রাত্যহিক উপস্থিতিটাকে একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে কর্‌ত।

অলকার আনন্দখনি ওই চিঠিখানি সারাদিন অমনি নীরবভাবে তার বুকের কাছে ঘুমিয়ে থাক্‌ত। অনেক রাত্রে যখন পাড়াসুদ্ধ ঘুমের কোলে ক্লান্ত শরীর আনন্দে মেলে দিত, যখন তাদের মেটে ঘরে পাশের খাটে তার পিসীমা কোলের ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে লেপের তলায় গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাক্‌তেন, তখন প্রদীপের ওই অতটুকু আলোকের স্পর্শে সেই ঘুমন্ত চিঠিখানি শতকণ্ঠে তার হৃদয়ের সমস্ত গোপন কথা নিয়ে জেগে উঠ্‌ত। ঘুমোবার আগে রোজ অলকা ওই সুখস্পর্শটুকু নিয়ে বিছানায় ঢলে পড়্‌ত।

এমনি শান্তভাবে বুকের মধ্যে কোমল সুখের অনুভূতি নিয়ে যখন অলকার দিন কাট্‌ছিল, তখন একদিন হাজার দুই টাকার নানা অলঙ্কার সঙ্গে

করে হাসিমুখে অরুণ এসে হাজির। বাবার একজন পুরাতন বন্ধুর কাছে টাকা ধার করে সে তার প্রেয়সীর জন্য কিছু আভরণ সংগ্রহ করে এনেছে।

আর দেরী করা চল্‌বে না। কালই অলকাকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে। সারাদিন বাপমায়ের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে চব্বিশ ঘণ্টা কেঁদে-কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে একরকম অনাহারে দিন কাটিয়ে পরদিন স্বামীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে নিজের জন্য ভবিষ্যতের কোনো ভাবনা চিন্তা না রেখে ম্লান মুখে অলকা শ্বশুরবাড়ী চলে গেল। কন্যার পিতার চিরন্তন ব্যথা নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ আপনার ঘরের কোণে নীরবে বসে রইলেন। সরস্বতীর সহস্র রূপও আজ তাঁকে অলকার সেই অশ্রুধৌত মুখের শোভা ভোলাতে পার্‌লে না। গৃহিণী ক্ষণেক্ষণে কাঁদ্‌ছিলেন, আর ভাব্‌ছিলেন আমিও এক দিন এম্‌নি করে মাকে কাঁদিয়ে এসেছি।

(৬)

অলকার শ্বশুর মস্ত বড়লোক। দুতিন পুরুষের সঞ্চিত ধনের উপর তিনি নিজে যা রোজ্‌গার করেছেন, তাতে এক পয়সাও না উপার্জ্জন করে

আরো চারপাঁচ পুরুষ বেশ নিশ্চিন্ত আরামে খেতে পরতে পারে।

অনেককালের বনিয়াদী ঘর বলে সে-বাড়ীর আদব-কায়দাও একটু উঁচু রকমের। মেয়েমহল আর পুরুষমহল সেখানে কোনোদিনও কাছাকাছি হয়েছে বলে বাইরের লোকে টের পায় না। যে-মায়ের কোলে জন্মেছে, সেই-মাকে দশবারো বছর যেতে-না-যেতেই ছেলেরা 'আপ্‌নি' বলে; হাজার ঠাট্টার সম্পর্ক হলেও বয়সে ছোট বড়-ভাজকে দেওররা কোনো দিন হেসে দুটো কথা বলে না। মেয়েদের বাইরের সম্মান সে বাড়ীতে খুব বেশী। তাদের সঙ্গে কি বিষয়ে কেমন ব্যবহার কর্‌তে হয়, সে সম্বন্ধে বাঁধা আইনকানুন আছে বল্‌লেই চলে। চৌধুরীবাড়ীর কোনো মেয়ে বউ কখনও পুরুষের বকুনি খেয়েছে বলে প্রায় শোনা যায় না।

তা ছাড়া এ বাড়ীর কুটুম্বিতাও প্রায় গোনা গাঁথা কয়েকটা বাড়ীর সঙ্গে ছাড়া হতে দেখা যায় না। বুনো জংলী অসভ্য লোকদের উপর এদের এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। তাই অচেনা অজানা মানুষকে চৌধুরীদের বড় ভয়।

ঘণ্টা চারেক আগে একখানা টেলিগ্রামে খবর দিয়ে এ হেন বাড়ীতে বউ নিয়ে অরুণ যখন এসে উঠল, তখন বাইরে প্রশান্ত মূর্ত্তি হলেও ভিতরে ভিতরে বাড়ীর প্রত্যেকটি লোকের মনে যেন আগুন জ্বল্‌ছিল। চৌধুরীপরিবারে এমন অপমান আজ পঞ্চাশ ষাট বছরের মধ্যে কেউ শোনেনি। অরুণ এই বাড়ীরই ছেলে, বাইরের নানা আন্দোলনের স্রোতে সে-কথাটা ভুলে গেলেও বাড়ীতে পা দিলেই এ বাড়ীর সমস্ত বিধান তার চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে। আজ বাড়ীর চেহারা দেখে ব্যাপারটা বুঝ্‌তে তার এক বিন্দুও গোলমাল হয়নি। অপমানের প্রচ্ছন্ন আগুনই শুধু যে তাদের মধ্যে জ্বল্‌ছিল, তা নয়, আর-একটা কিসের আভাসও যেন তাদের মুখের চেহারায় পাওয়া যাচ্ছিল। অরুণ ভেবে পাচ্ছিল না, বাড়ীতে এমন কি দুর্ঘটনা ঘটেছে যাতে সমস্ত বাড়ীর উপরেই একটা ঘন অন্ধকারের ছায়া পড়েছে। কাউকে সে-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন কর্‌তেও তার সাহস হচ্ছিল না, কারণ এতদিন পরে বাড়ী ফিরে আসার পরও কেউ তার সঙ্গে একটাও কথা কয়নি। দরোয়ান চাকরেরা নিঃশব্দে গাড়ীর মাথা

থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া আর একটি দাসী এসে বৌকে ঘরে নিয়ে গেল, তবে তার মধ্যে কোনো আদর-অভ্যর্থনার চিহ্ন দেখা গেল না। কিন্তু অরুণকে কেউ ঘরে ঢুকতেও বল্‌লে না।

বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অরুণ দেখ্‌লে, তিনি শয্যাশায়ী। আজ একমাস হল সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে হাত-পা পক্ষাঘাতে অচল হয়ে আছে। তবে জ্ঞান বেশ টন্‌টনে, কথা বল্‌বার শক্তিও ভাল রকম। বাবাকে প্রণাম করে অরুণ জান্‌তে পার্‌লে, যাঁর কাছে সে তুই হাজার টাকা ধার করেছিল সেই বন্ধুই তাঁর রোগের চিকিৎসক। অরুণের ধারের কথাটা তবে জানা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু পিতার রোগশয্যার কথা সে ইতিপূর্ব্বে ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পায়নি। অরুণ বল্‌বার কোনো কথা না পেয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেল।

আজ অরুণের অবস্থা যেন তুকূলহারা! খবরের কাগজে তার সুকীর্ত্তির খবর দিয়ে জয়ডঙ্কা বাজাবার সাহস কিম্বা ইচ্ছা আজ আর তার বিশেষ নেই। বাড়ীর লোকের চোখে ত সেটা তুষ্কীর্ত্তি বলেই

ঠেকেছে, তার উপর কঠিন পীড়াগ্রস্ত পিতার এতদিন খোঁজখবর নেয়নি বলে লজ্জায় তার মুখ কালি হয়ে গিয়েছিল। কলেজের ছেলেদের সাম্‌নে তার যে বক্তৃতার স্রোত বিনা বাধায় হু হু করে বয়ে যেত, যে তর্কযুক্তির জালে অপর পক্ষকে সে আধমরা করে ফেল্‌ত, সে-সব আজ এমন নিঃশেষে কোন্ অতলে যে ডুব দিয়েছে তার ঠিক নেই। নিজের কাজটাকে যতখানি সমর্থন করা নিতান্তই সোজা সেটুকুও আজ সে পেরে উঠ্‌ছে না। তা ছাড়া সমর্থন কর্‌বেই বা কার কাছে? কেউ ত তাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করেনি।

অলকা সারাদিন নিরানন্দ বাড়ীর এক কোণে দুটি-একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে একটু-আধটু ভাব করে কাটিয়ে সন্ধ্যার সময় মনটাকে একটু খুসী কর্‌বার জন্যে এবং অরুণকেও একটু আনন্দ দেবার জন্যে তার নূতন অলঙ্কারগুলি পরে' ভাল করে এলো খোঁপা বেঁধে ছোট একটি সিঁদুরের টিপ কেটে একখানা সোনালিরঙের শাড়ী পরে নিজের ঘরে যাবার উদ্যোগ কর্‌ছিল। তার সাজসজ্জাটা বাড়ীর ছোট মেয়েরাই বিশেষ উৎসাহে করে দিয়ে-

ছিল। কারণ তারা জান্‌ত বাড়ীতে নূতন বৌ এলে সারাদিন তাকে ঘিরে আনন্দ করতে হয়; বধূ-বিশেষকে নিয়ে যে করতে নেই, ঐ বুদ্ধিটা তাদের মাথায় ঢোকেনি, এবং তাদের এ বিষয়ে কেউ কোনো উপদেশও দিয়ে যায়নি। ছোট একটি ভাসুরঝির হাত ধরে সলজ্জ হাসিতে মুখখানি উজ্জ্বল করে এ বাড়ীতে তার একমাত্র আপনার জন অরুণের ঘরে গিয়ে যখন সে উঠ্‌ল, তখন রাত প্রায় দশটা। মেয়েটি তাকে রেখে চলে যেতে অলকা দেখ্‌লে অরুণ টেবিলের পাশে কি একখানা কাগজ নিয়ে মহা চিন্তাকুল হয়ে বসে আছে।

সেখানা অরুণের পিতা চৌধুরী মহাশয়ের জবানী পত্র। পত্রে তিনি অরুণকে জানিয়েছেন যে যখন তাঁর মত না নিয়েই অরুণ তার জীবনের এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে ফেলেছে তখন বুঝ্‌তে হবে যে সে এখন সব বিষয়ে উপযুক্ত হয়েছে। তাই তাঁর অনুরোধ যে পিতার কাছে পাবার আশায় যে ঋণটা সে করেছে, সেটা যতদিন না নিজে শোধ করে ততদিন যেন সে এ বাড়ীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখে। এবং কোনো

কাজে তাঁর পরামর্শ নেওয়া যখন সে দরকার মনে করেনি, তখন গলগ্রহের মত পিতার উপার্জ্জিত অন্ন ধ্বংস করতেও বোধ হয় সে লজ্জা বোধ করবে। বৌমা দরিদ্র গৃহস্থের নির্দ্দোষী কন্যা, ইচ্ছা করেন ত এই বাড়ীতেই কিছুদিন কাটাতে পারেন। দরিদ্রকে অন্নদান এ বাড়ীর সনাতন ধর্ম্ম; পুত্র যাঁকে কন্যাদায় হতে উদ্ধার করেছেন তাঁকে কন্যার ভরণপোষণের জন্য আবার পীড়া দিতে চৌধুরীবংশ কখনও অগ্রসর হবেন না। আর এতে যদি বৌমার অপমান হয় তবে তিনিও স্বামীর সঙ্গ নিতে পারেন।

অলকা চিঠির খবর কিছুই জান্ত না। তার ইচ্ছা ছিল আজকের তার এমন মনোমোহন সাজ দেখে অরুণ তারিফ করে অন্ততঃ দুটো কথা বলে। সে হাসিমুখে এগিয়ে এসে অরুণের কাঁধের উপর হাত রেখে বলে উঠ্ল "কাগজখানা নিয়ে কি এমন ভাব্না ভাব্ছ যে একবার ফিরে তাকাবারও অবসর হল না।"

অরুণ কি করে এই সংবাদটা স্ত্রীকে দেবে সে সম্বন্ধে অনেক সুশোভন বক্তৃতা ঠিক কর্‌বার ইচ্ছায় ছিল; কিন্তু বড়লোকের ছেলে সে, আজও তার

কলেজের শেষ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি, অর্থোপার্জ্জন কাকে বলে সে কথা তাকে একদিনও ভাব্‌তে হয়নি, আজ অকস্মাৎ গোপন ঋণের বোঝাটা এমন নির্দ্দয়ভাবে তার ঘাড়ে চড়ে বসাতে তার আর কোনো কথা মনেই আস্‌ছিল না। অগ্নিবরণা অলকার রূপ আজ তার চোখে গাঢ় অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অলকার কথার উত্তরে সে হঠাৎ বলে বস্‌ল, "ভাবছিলাম অন্য কোথাও বিয়ে কর্‌লে আজ আমি পাঁচ-দশ হাজার টাকার মালিক হতাম, আর তোমাকে উদ্ধার কর্‌তে গিয়ে, দু হাজার টাকা ঋণ মাথায় তুল্‌লাম আর সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ঘর সব হারালাম।"

অলকা চম্‌কে উঠে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে দাঁড়াল। এমন কঠিন কথাগুলো বল্‌বার ইচ্ছা অরুণের মোটেই ছিল না; কিন্তু যখন বলে ফেলেছে তখন আর উপায় নেই। দারিদ্র্যের দুঃখ তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে দিয়েছিল। চিঠিখানা অলকার গায়ে ফেলে দিয়ে সে সেইখানেই চুপ করে বসে রইল।

চিঠি পড়ে অলকার যৌবনস্বপ্ন এক মুহূর্ত্তের

মধ্যে টুটে গেল। নিজের প্রতি ধিক্কারে তার মন ভরে উঠ্‌ল। ছি, ছি, কি নির্লজ্জ, কি কাঙাল সে! শুধু দয়া করে, শুধু দরিদ্রের দুঃখ মোচন কর্‌বার জন্য যে তাকে বিবাহ করেছে, তার কাছে সেইটুকু উপকার পেয়েই তুষ্ট না থেকে, সে কিনা পথের কাঙালের মত ভালবাসা ভিক্ষা কর্‌তে এসেছে! সাজসজ্জার ছলনায় ভুলিয়ে ফুস্‌লিয়ে দয়ালুর কাছ থেকে তার সর্ব্বস্ব আদায় করে নিতে এসেছে। ভিখারীর কন্যা সে, তার এত স্পর্দ্ধা! অলকা ভুলে গেল, যে, কাউকে ভোলাতে সে আসেনি; আনন্দ পেয়ে আনন্দ দিতেই সে এসেছিল। কিন্তু এই তীব্র বেদনা তাকে নিজের উদ্দেশ্যও ভুলিয়ে দিয়েছিল। তাই তার সমস্ত আভরণ প্রসাধন তাকে ঘিরে ধরে ধিক্কার দিচ্ছিল; সোনালি শাড়ীখানা যেন বেড়া-আগুনের মত জ্বলে উঠে তার প্রতি-অঙ্গ জ্বালাময় করে তুল্‌ছিল।

অলকা বল্‌লে, "তবে আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

অরুণ বল্‌লে, "তুমি থাক না, তুমি বউ, তোমার ত অধিকার আছে। কিন্তু ঘরের ছেলে আমি,

পরের দুঃখ সইতে পারিনি, তাই যত দোষ ত আমারই !”

অলকা খাড়া দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে উত্তর দিলে, “আমার আবার কিসের অধিকার ? আমার খাওয়া-পরার দাম আগাম না দিয়ে কেবল নিরন্নের শুক্‌নো মুখ দেখিয়ে অম্‌নি ঢুকেছি, এখানে থেকে পিতৃঋণ আর বাড়াতে চাইনে।”

কথা বল্‌বার সময় অলকার মুখে একটু দুঃখের রেখা কি চোখে একবিন্দু জলও দেখা যায়নি, আগুনের জ্বালার মত সমস্ত মুখটাই রাঙা হয়ে উঠেছিল। যদি তার মুখে একটু বেদনা ফুটে উঠ্‌ত, যদি চোখের দৃষ্টিতে প্রেমের দাবী নিজের অধিকার ব্যক্ত কর্‌ত, তাহলে হয় ত অরুণ দুঃখের মধ্যেও তাকে সঙ্গিনী করে সুখ পেতে চাইত, হয়ত বা তাতে ফলও পেত। কিন্তু আজ যশোগীতি ধ্বনিত হবার আশাও টুট্‌ল, প্রেমের আলোও বুঝি নিভে গেল, রইল শুধু অপমান, দারিদ্র্য আর দুঃখ ! কেন তবে সে অন্যের মুখের দিকে চাইবে ?

নিজেকে চাপা দেবার শক্তিটা, রুদ্র তেজের

আগুনটা অলকার মন থেকে তখনকার মত যদি সরে যেত, তবে হয়ত বা সবই অন্য রূপ ধর্‌ত, এই আঘাতে তাঁর হৃদয় ছিন্ন না হয়ে ব্যাকুল আগ্রহে শেষ অবলম্বনটুকু আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধর্‌ত। কিন্তু অলকার সমস্ত মন সে-মুহূর্ত্তে তাকে ঝাঁকি দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছিল,—তোমার কোনো অধিকার নেই, যেচে আর অপমানের ভার বাড়িও না। তাই সে সেই কুমারী অলকার মত দৃপ্তমুখে ঘাড় বেঁকিয়ে ফিরে দাঁড়াল। একবার মুখ তুলে চাইলেও না। অরুণ মুখে কিছু বল্‌লে না, মনে মনে ভাব্‌লে, "ভিখিরীর মেয়ের এত তেজ !"

* * * *

পরদিন অলকা আর অরুণ একসঙ্গে চৌধুরী মহাশয়ের পায়ের ধূলো নিয়ে বিদায় হল। বাড়ীর লোকে ভাব্‌লে—একসঙ্গেই যাচ্ছে।

অলকাকে রেখে অরুণ যখন ঋণশোধের পথ খুঁজ্‌তে যাবে তার আগে অলকা শুধু একটা অনুরোধ করেছিল, "দেখ, তোমার উপর আমার কোনো অধিকার না থাক্‌লেও, একটি অনুরোধ আমার

রেখ। রোজ না হোক, দুচারদিন অন্তর অন্ততঃ একখানা শুধু খামের উপর আমার নাম লিখে পাঠিও। কারণ তোমার কাছে আমার অধিকার নেই বল্‌লেও আর কারুর কাছে সেটা স্বীকার করতে আমি পারব না।" এ ছাড়া আর কোনো কথাই অলকা বলেনি। অরুণ ভাবলে,—আমার খবরের জন্যে নয়, কেবল নিজের মান বজায় রাখ্‌বার জন্যেই এ অনুরোধ! ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কোন্‌টা যে অলকার মনে বেশী ছিল, তা অবশ্য ঠিক বলা যায় না। যা হোক অরুণ রাজি হয়েই গেল।

(৭)

প্রতি সপ্তাহে দুচার বার এক লাইন লেখা কিম্বা শূন্য কাগজভরা একখানা খাম অলকার নামে আস্‌ত এবং অলকার তরফ থেকে কেবলমাত্র কুশল প্রার্থনা করে সেই রকম চিঠি অরুণের নামে প্রায়ই যেত। এবার ডাকহরকরা প্রতিদিনই ডেকে চিঠি দিয়ে যায়। এবারও অলকা সকলের চোখের আড়ালে চিঠি খোলে, কিন্তু সে অন্য কারণে। মাঝে মাঝে চিঠি পেতে দেরী হলে বার বার শূন্য চিঠির তাগিদ দিয়ে অলকা চিঠি আনিয়ে তবে ছাড়ে।

তার অত তেজ, অত মান যে কোথায় গিয়েছিল জানি না। চিঠি খুলে বস্‌লেই সেই প্রথম-দেখা অরুণের প্রশংসমান দৃষ্টি তার মনে পড়ে যেত, ইচ্ছা কর্‌ত অনধিকারের সমস্ত শাস্তি নিয়েও একবার সেখানে ছুটে চলে যায়; একবার দেখে আসে নির্ম্মমের মত এই অর্থহীন শূন্য চিঠি পাঠাবার সময় তার মুখখানা কেমন হয়। এ তারই অনুরোধ হলেও অরুণ কি ইচ্ছা কর্‌লে দুটো কথা লিখ্‌তে পারে না; আগেকার সেই চিঠির মত না হোক, তার শতাংশের একাংশ আনন্দও কি দিতে নেই! একদিন চিঠি এল,—এরকম ছেলেখেলা কর্‌বার সময় অরুণের নেই। সে নিজের অঙ্গীকার থেকে মুক্তি চায়। তাঁকে এখন জীবনসংগ্রামে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়্‌তে হচ্ছে।

শূন্য চিঠির নিষ্ঠুর খেলাও অল্প দিনেই শেষ হয়ে গেল। ভাষাহীন তাগিদে আর ফল ফলে না। অলকার মান বুঝি আর বাঁচে না! কিন্তু যেমন করে হোক সে তার উপায় কর্‌বেই।

চোখের জলে অনেক খাম কাগজ নষ্ট করে একদিন সে একটা উপায় স্থির কর্‌লে। নিজের

হাতেই খামের উপর অরুণের হাতের লেখা নকল করে একাধারে অরুণ আর অলকা দু-জনের কাজই সে এবার থেকে করবে।

পাড়ার যে নিরক্ষর ছেলেটিকে ধরে সে চিঠি ডাকে দেওয়াত, এখন তার কাজ আরো বেড়ে গেল। কারণ এখন পালা করে দুজনের চিঠিই তাকে ডাকে দিতে হয়।

পুরোনো চিঠি কখানা খুলে কতদিন অলকা মনে করত,—একখানা এই চিঠি খামে করে নিজের নামে ডাকে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কি জানি কেন সেগুলো খোয়া যাবার ভয় তার প্রায়ই হত। তবু সেইগুলো নূতন করে ডাকঘরের ছাপ নিয়ে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে হয়ত সেই হারানো দিনের আনন্দ আবার জেগে উঠতে পারত!

হাতে তুলে খামে ভরতে গিয়ে কত দিন সে ফিরে এসেছে। ভেবেছে, এমন করলে চলবে না— আমাকে পাথরের মত কঠিন হতে হবে! স্বামীর সেই-সব চিঠিতে আর তাঁর মুখের কথাতেও অলকা এক দিন শিক্ষা পেয়েছিল যে মানুষের মন বদলায়। তখন সেটা তত্ত্বকথার মত ছিল; নিজের

ক্ষেত্রেও যে একদিন লাগ্‌বে তা সে ভাবেনি। শুনেছিল মানুষের মন নদীর স্রোত; সে দিনে-দিনে ক্ষণে-ক্ষণে বদ্‌লে যাচ্ছে। কিন্তু মন যদি চিরকাল এক জায়গায় নাই থাকে, যদি একদিনের পরিচয় চিরদিনের না হয়, তবে মানুষ অত নিষ্ঠুরের মত অন্যের মন নিয়ে খেলা করে কেন? কেন সে বলে যায় না তার সে-সব দিনের কথা শুধু সেইসব দিনেরই? অলকা এর মীমাংসা করে উঠ্‌তে পার্‌ত না। যদি মানুষের মন নদীর স্রোতই হয়, তবে দুটো নদীর স্রোত কেন একই ভাবে বয় না? দুটো মানুষের মন কেন একই সঙ্গে বদ্‌লায় না? ভগবানের এ বড় অবিচার! তিনি যদি মনটা গতিশীল করেছেন, তবে তার গতি অমন এলোমেলো কেন? সে কেন তাল কাটিয়ে অমন বেতালা চলে যায়?

মাঝে মাঝে তার ইচ্ছা করত স্বপ্নের বিভীষিকার মত তার সব দুঃখদ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাক। কিন্তু সে জান্‌ত, বিধির বিধান অতি কঠোর, এ বিধানে অসম্ভব সম্ভব হয় না। তবু মানুষের মন তারি পথ চেয়ে থাকে, নিজেকে সে ওই তুচ্ছ আশার মোহেই ভুলিয়ে রাখে।

নিজের এইসব দুর্ব্বলতায় অলকা নিজের উপর রেগে আগুন হয়ে উঠ্‌ছিল। কেন সে পরের জন্যে অমন করে কেঁদে মর্‌বে? তার নারী-গৌরবে অত বড় ঘা সে কিছুতেই সইবে না।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে অলকার শরীর মন উদ্যত বজ্রের মতন হয়ে উঠ্‌ছিল। এ বজ্র যে কার বুকে পড়্‌বে, কার সর্ব্বনাশ কর্‌বে, তা সে নিজেই ভেবে পাচ্ছিল না। তার মনে হত, হয়ত আর কাউকে না পেয়ে সে নিজেকেই সংহার কর্‌বে, নিজের অন্তরের অমূল্যধন স্নেহ প্রেম সব সে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেল্‌বে।

যখন তার অন্তর চাইত স্নেহে প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে তখন সে বসে বসে মনে মনে সূক্ষ্ম তর্কজাল বিস্তার করে মনের সঙ্গেই লড়াই লাগিয়ে দিত। বাস্তবিক স্নেহ প্রেম ভালবাসা এ-সবের প্রয়োজন কি? কেন, এম্‌নি কি দিন চলে না? মানুষ যদি নিজের কাজগুলো করে যায়, কেউ যদি কারুর জন্যে না তাকায়, কেবল প্রয়োজন বুঝে, কর্ত্তব্য দেখে করে যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি? লোকে বলে বটে অমন করলে আর সৃষ্টি চলে না!

তাই অলকা কখনও কখনও ভাব্‌ত—আচ্ছা, নাই চল্‌ল সৃষ্টি! এতদূর পর্য্যন্ত ভাব্‌তেও তার বাধা পড়্‌ত না—মনে হত, হ্যাঁ, হয়ত এসবের প্রয়োজন আছে। হয়ত স্নেহ প্রেমই জগতের কেন্দ্র। দুরন্ত ঝড়ের ঘায়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েও ঐ প্রেমকে মানুষ ঠেল্‌তে পারে না, প্রেমে যে বেদনা আনে তারি তীব্র মধুর আনন্দ শূন্য হৃদয়ের দুঃখহীন চির নিশ্চিন্ততার চেয়ে বরণীয়। কিন্তু থাক্‌লই বা প্রয়োজন, হলই বা জগতের কেন্দ্র! জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? যে জগৎ তাকে অস্পৃশ্যের মত দূরে ঠেলে রেখেছে, সে-জগতের সঙ্গে ছন্দে তালে ঐক্য রেখে সে কেন চল্‌তে যাবে? সে সৃষ্টিছাড়াই হবে। কেউ যা হতে পারেনি, হতে পার্‌বেও না, তাই সে হবে। আর এত করে ঠেকা দিয়ে, তালি দিয়ে নিজের অবস্থা জগতের ছাঁচে ঢালা নিটোল সুন্দর কর্‌তে চাইবে না। এই রকম সব ভাব্‌না ভেবে ভেবে অলকা দেখ্‌ত মনটা যেন তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠ্‌ছে, কোনো-রকম ভাবের কি রসের লেশ খুঁজে-পেতে বের করা কষ্টকর। নিজের মনের এই শুষ্ক

কঠিন মূর্ত্তিতেই সে বেশ একটা নিষ্ঠুর আনন্দ বোধ করত। এমন পাষাণ প্রাণে বেদনা দিয়ে কেউ কাঁদাতে পারবে না; এমনি করেই মাথাটাকে চিরদিন উঁচু করে চলা সহজ। নত হবার আর কোনো ভয় থাকবে না।

অলকা তার মনটাকে কেবল বিচারবুদ্ধি দিয়ে সাজিয়ে কঙ্কালের মত আনন্দহীন কঠিন করে তুলতে পারলেই যেন বাঁচত। বিচারবুদ্ধির উপরে প্রয়োজনের অতীত যে একটা হৃদয়ের রাজ্য আছে, আজ সেটাকে অস্বীকার করতে পেলেই তার মুক্তি। সে রাজ্যের বেদনা ও ব্যথার আনন্দ আর পরাজয়ের সুখ আজ তার অসহ্য। সে নিজে যেখানে জয়ী হতে চেয়েছিল, স্বেচ্ছায় যেখানে সে মাথা হেঁট করেনি, ঘাড় টিপে সেখানে তাকে ধূলিশায়ী করে দিলে সে সইতে পারবে না। আনন্দে যদি সে পরাজয় স্বীকার করতে পারত তবেই ছিল তার সুখ। ফলে ফুলে শস্যক্ষেত্রে সকল শোভার মধ্যে সেই যে হৃদয়রাজ্যের উপভোগের জন্য ডালি সাজানো, সকল জিনিসের রঙে, সকল গানে গন্ধে যে রাজ্যের অধিকার, অলকা আজ সে রাজ্য ছেড়ে

মুক্ত হতে চায়। সে চায় শুষ্ক কঠিন মূর্ত্তিতে শুধু সত্য আর প্রয়োজন দেখ্‌তে।

এমনি ভাবের সময় সে মানুষের মিষ্টি কথার, প্রিয়জনের আদরের মূল্য বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ত না। তার স্বামীর লেখা পুরানো চিঠিগুলো তখন তার কাছে অর্থশূন্য হাস্যকর জঞ্জাল মনে হত। সে ভেবে পেত না, সময় নষ্ট করে অকারণে এই রকম কতকগুলো পাগ্‌লামির উচ্ছ্বাস করে মানুষের কি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। সেই কোন্ আদি যুগ থেকে মানুষের এই যে চিরন্তন বিরহবেদনা, যা নিয়ে যুগে যুগে কালে কালে কবিরা কত গান গেয়ে গেছেন, একদিন সেই-সবের মাধুর্য্যে সে ডুবে থেকেছে, তাতে কত আনন্দই পেয়েছে; কাব্যের মত অত বড় সত্য আর কোনো জিনিসকে ভাবেনি। কিন্তু আজ ভাব্‌ছে—তার মধ্যে আছে কি? আশ্চর্য্য এই, এত বড় একটা মিথ্যা কি করে অনাদিকাল ধরে তেমনি একইভাবে মানুষের মনকে ঘিরে আছে! তার অন্ধ চোখ কি কোনো দিনই খুল্‌বে না? ঝড়ঝঞ্ঝার কঠোর নিষ্ঠুর মূর্ত্তিই ত জগতে সত্য। তাই ত চোখে কানে ঠেকে, আর কিছুই ত নেই।

অলকা এত তর্কযুক্তি করেও কিন্তু নিজেকে পরাস্ত কর্‌তে পার্‌ছিল না। মনটা তার কঠিন হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু সুযোগ পেলেই সে সেই দুঃখের রাজ্যেই ছুট্‌তে চাইত। কঠিন নিগড়ে বাঁধা হয়ে দুঃখহীন লোকে থাক্‌তে সে কেমন হাঁপিয়ে উঠ্‌ত। দুঃখ নির্ব্বাণ কর্‌বার এ উপায়টা সে ভাল করে মানিয়ে নিতে পার্‌ছিল না।

(৮)

সেদিন সকালে অলকার চিঠিখানা বেশ ভারী-ভারী ঠেক্‌ছিল। তা ছাড়া সেটা যে তার নিজেরই জাল নয়, তা এক নিমিষেই অলকা বুঝে ফেলেছিল। আজকে যে তাতে কি থাক্‌তে পারে অলকা অনেক ভেবেও ঠিক করে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না। সারাদিন চিঠিখানা লুকিয়ে রেখে রাত্রে দেখ্‌লে—স্বামী তাকে মস্ত একখানা চিঠি লিখে ফেলেছেন। অত-বড় চিঠি দেখেই আনন্দে অলকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কি মনে করে তখনি আবার আগের মত ঔদাস্যমাখা স্থির নিশ্চল হয়ে গেল।

অরুণ এত দিনের অনাদরের জন্য ক্ষমা চেয়ে জানিয়েছে, দারিদ্র্য তার হৃদয় এতদিন কঠিন চাপে

চেপে রেখেছিল; আত্মীয়বন্ধু সব সে ভুলে গিয়েছিল। আজ পিতা তার অপরাধ ক্ষমা করেছেন; এই দীর্ঘকালে দুহাজারের মধ্যে পাঁচ শত টাকা মাত্র শোধ হয়েছে, তবু তার চেষ্টা ও পিতৃ-আদেশে অচলা নিষ্ঠা দেখে পিতা খুসী হয়ে সব দোষ মার্জ্জনা করেছেন। তাই অরুণ দুদিনের মধ্যে অলকাকে নিতে আস্‌ছে। এবারে আর কোনো অনাদর হবে না। তার দারিদ্র্যের সমস্ত অপমান মুছে যাবে।

বার চোদ্দ পৃষ্ঠা জুড়ে চিঠিতে এই কথাগুলিই নানা ভাবে নানা স্বুরে সাজানো ছিল। অলকা চিঠি শেষ করে একবার হাস্‌লে। তারপর আর না দেখে তুলে রেখে দিলে।

জামাই শ্বশুর-শাশুড়ীকেও মেয়ের দ্বিরাগমনের খবর দিয়েছিলেন। এত বড় মেয়ের যে দ্বিরাগমন কর্‌তে হল এই তাঁদের ক্ষোভের কারণ ছিল। যাক, তবু যে এতদিনে বেয়াইএর বৌ নেবার সময় হল এই ঢের।

জামাই এলে পাড়ার যত মেয়ে মিলে মহা কলরবে অলকাকে সাজাতে বস্‌ল। সে কি পাতা-

কাটা চুল টেপার ঘটা! আল্‌তা কাজলেরই বা কি বাহার! সিঁদুরের টিপ সাত জনে সাত রকম পরিয়েও পছন্দ করে উঠ্‌তে পার্‌ছিল না। শাড়ীর বাহারও কম হয়নি। অলকা মনে মনে হাস্‌ছিল। সেদিনকার তার প্রসাধনের অপমানের ব্যথা আজও ত সে ভোলেনি।

ঘরে ঢোক্‌বার আগে আড়ালে সমস্ত সাজ ঘুচিয়ে ফেলে শুধু একখানা কাল্পেড়ে শাড়ী আর চারগাছা কাঁচের চুড়ি পরে অলকা স্বামী-সন্দর্শনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিল।

অরুণ কাছে এগিয়ে আস্‌তেই তার পায়ে প্রণাম করে অলকা বল্‌লে, "আমাকে রেখে যাবার দিন তুমি কেন জানি না আমার গয়নাগুলো চাওনি, আমিও তখন লজ্জার মাথা খেয়ে নিজে হতে দিতে পারিনি, পাছে লোকে আমার অপমানের কথা জেনে যায়। আজ আমি এই-সব ধরে দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাও।"

অরুণ গহনার পুঁটুলি ঠেলে ফেলে বল্‌লে, "ওকি! আমি ত ও নিতে আসিনি। আমি তোমায় নিতে এসেছি।"

অলকা বল্‌লে, "সে ত এখন হবার জো নেই। যদি কোনো দিন ঋণ শোধ কর্‌তে পারি তবেই যাব। তুমি পিতৃ-আদেশ পালন করে পিতৃভক্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়েছ, আমি পিতৃঋণ শোধ না করে তোমার সংসার দখল করি কি বলে?"

নদীর স্রোতের মত আজও মানুষের মন বদ্‌লেছিল, কিন্তু সে অন্য দিকে।

আনন্দ-প্রদীপ

এই সবে সেদিন, ফাল্গুনের প্রথমে শ্রীপঞ্চমীর দিনে শ্রীদেবী ধরার গায়ে তাঁর শ্রীহস্ত বুলিয়ে দিয়ে সমস্ত আকাশ বাতাস কানন কুসুম শ্রীমণ্ডিত করে তুল্‌লেন! সেইদিন থেকে গাছে গাছে সমস্ত ফুল বসন্তলক্ষ্মীর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌বার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ফুটে উঠ্‌ল, হাজার ফুলের হাজার গন্ধ ধূপের মত ঊর্দ্ধমুখ হয়ে তাঁর আগমন ভিক্ষা করতে সুরু করে দিল, তাদের এই শব্দহীন পূজায় মানুষের মনও চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল; মানুষপূজারী তার 'গানের ডালায়' নৈবেদ্য সাজিয়ে তরুলতার পূজার দোসর হয়ে দাঁড়াল।

তারপর যেদিন ফাল্গুনের মাঝামাঝি আগমনীর গানে গন্ধে উন্মনা হয়ে বসন্তলক্ষ্মী নেমে এসে তাঁর জগৎ-জোড়া সিংহাসনের শ্যামশোভা শতগুণ বাড়িয়ে দিলেন, পৃথিবী তাঁর আশাপথ চেয়ে এত দীর্ঘদিন ধরে যে আসন নানা রত্নে সাজিয়ে

তুল্‌ছিল, সেই আসন যেদিন তাঁর অঙ্গস্পর্শে ধন্য হয়ে গেল, যেদিন মাঘী-পূর্ণিমার স্বর্ণপ্রদীপ দেবীর আরতির আলোয় মানুষের চোখ জুড়িয়ে দিলে, পাখীর বাসায় বাসায় আরতির ধ্বনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, সেদিন মানুষ আর দেয়ালগাঁথা ঘরের নির্ব্বাসন সইতে পার্‌লে না। তার চিরনবীন প্রাণ মুক্তির আশায় ছুটে বেরিয়ে পড়্‌ল !

মানুষ তার সঙ্গে নিয়েছিল একটি তরুণী সখীকে। সেই তরুণীর পা মাটি ছোঁয় না, তার গতির সঙ্গে-সঙ্গে আশে-পাশে সমস্ত তুচ্ছ ধূলিকণাও মধুর হয়ে ওঠে, সেই মাধুরীই মানুষের মনে আনন্দ জাগিয়ে রাখে ! তরুণীর দৃষ্টি কোথাও বাধে না, হাজার উঁচু পাঁচিল দিয়ে রাখ, হাজার কাঁটার বেড়া দিয়ে থাক, তোমার ঘরের সকল-কিছুই তার চোখে পড়্‌বে, তার চোখের ছায়ায় মানুষও সমস্ত জগতের ছায়া দেখে নেয়।

মানুষ কিন্তু এই সখীর দেখা দিনে বড় পায় না, রাত্রেও জ্বলন্ত মশাল জ্বেলে তাকে খুঁজ্‌তে গেলে সে পাখীর মত কোথায় উড়ে চলে যায়। সে দিনের আলোয় দেখা না দিলেও সে ছায়াময়ী ;

তার অঙ্গ স্পর্শ মানুষ কোনো দিন করেনি ; কাজের কথা ভুলে, সকল সন্ধান ছেড়ে দিয়ে, যখন মানুষ নিজেকেও মনে করে রাখে না, অমনি পূর্ণিমার আলোয় যখন সে সেই বাইরের জগতের সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ডাক শুন্‌তে পায়, তখনি পথের সাথী হয়ে, বিশ্বভুবনের পথ দেখিয়ে দেবার জন্যে তার ছায়া-সখীটি একটু দূরে পাশেই এসে দাঁড়ায়, তার খোলা চুলের মৃদু গন্ধ, আঁচলের বাতাস মানুষকে বলে যায়—তোমার পথের সাথী এসেছে।

মাঘীপূর্ণিমার রাত্রে ছায়া-সখীর সঙ্গে পথে বেরিয়ে চাঁদের আলোর উপর দৃষ্টি রেখে শালগাছের ছায়ায় নিজেকে একটু আড়াল করে যেতে তার মনে হল—আকাশে আজ এত আলো কেন ? পৃথিবী আজ অজস্র আলোর বুকে এমন ছায়ার ছবি এঁকেছে কি করে ? শুনেছিলাম না চাঁদ মরা ? তাকে এত রূপ, এমন মধুর দৃষ্টি আজ কে ধার দিয়েছে ?

সখীর চোখে মানুষের মনের প্রশ্নটি ফুটে উঠ্‌ল। সে তার অতল সাগরের মত চোখ দুটি তুলে একটু মধুর হেসে বল্‌লে—এই কথাটাই জান না ? আচ্ছা আজ তবে শুনে রাখ—

সৃষ্টি যখন প্রথম হয়, তখন দুটি প্রাণী হয়; মাত্র তারাই দুজন আকাশ ধরণী সমস্ত পূর্ণ করে জগতের মাঝখানে বাসা বেঁধেছিল। তারা দুজন কিন্তু থাকৃত দুজায়গায়। এই দুজনের নাম ছিল সুনীল আর শ্যামা।

শ্যামা থাকৃত ছায়ানিবিড়, একটি বনের বুকের মাঝখানটিতে। গাছের তলায় কত যুগযুগান্ত ধরে তখনকার দিনেও পাতা পড়ে পড়ে পুরু গালিচার মত স্তূপ হয়ে থাকৃত। সেই পাতার গালিচার উপর গাছের ডালের ঘন-বিনোনির চাঁদোয়ার তলে, তুষারের-মুকুট-পরা যোজন-জোড়া দেয়ালের পাশে সাগরিকা নদীর ধারে শ্যামার বাড়ী। সেই বিছানার উপর সারাদিন বসে বসে সে সে-দিকে চেয়ে থাকৃত, কখন বা ঘাটে পা ডুবিয়ে নদীর জলে ছোট দুখানি হাত দিয়ে ঢেউ তুলে দিত, আবার কখনো বা বনের ভিতর ঢুকে আঁচলের দোলা দিয়ে গাছের মাথায়-মাথায় শিহরণ জাগিয়ে দিত। গাছের ডালগুলি ঝুঁকে পড়ে আনন্দে তার সঙ্গে খেলা করতে ছুটে আসৃত, অমনি নদীর জলও কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ করে ডাঙায় উঠে এসে শ্যামার আঁচল চেপে ধরতে যেত।

খেয়ালী শ্যামা হয়ত তখনি সব খেলা ফেলে দিয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে বস্‌ত। বন কি করে? মনের দুঃখে মাথা নীচু করে বসে থাকৃত, আর দু'চারটা গাছ অভিমানে একেবারে আছড়ে পড়ে মাটিতেই শুয়ে পড়ত, সাগরিকা ছোট্ট মেয়ের মত রাগ করে বেঁকে বেঁকে ঘর ছেড়ে কোথায় চলে যেত।

এই দুষ্টু মেয়ে শ্যামার বন্ধুবান্ধব কেমন দেখ্‌লে ত? কিন্তু সে নিজে কেমন দেখ্‌তে ছিল তাও ত একটু জানা চাই। বসন্ত উদয় হতে না হতে শাল-বনে কচি কচি পাতায় কেমন রং ধরে দেখেছ? শ্যামার গায়ের রং ছিল তেমনি। সে একখানা সবুজ রঙের জরি-পেড়ে শাড়ী পর্‌তে খুব ভাল বাস্‌ত, সেখানার রং ছিল প্রথম-শরতের ধানের ক্ষেতের মত, তাতে পাখী ফুল পাতা আরও কত কি নক্‌সা-কাটা। শ্যামার চুল ছিল দূর মাঠের শেষের আঁধার বনের মত ঘন-নিবিড়, নাড়া পেলেই তাতে বনের মাথার মত তরঙ্গ খেলে যেত। বর্ষার দিনে সেই চুলের রাশ এলিয়ে শ্যামা মনের সাধ মিটিয়ে স্নান কর্‌ত! শ্যামার চোখ দুটি যে কত সুন্দর তা বলা শক্ত। সন্ধ্যাবেলা সূর্য্যাস্তের শেষ

স্মৃতি বুকে ধরে দীঘির কালো জল যখন চুপটি করে পড়ে তার অতীতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে, তখন তার দিকে চেয়ে দেখেছ কি ? হয়ত শ্যামার চোখের দৃষ্টি তেমনি ছিল ! কিম্বা তাই বা বলি কি করে ? নদীর জলে ভোরের আকাশের রক্ত-রাগের সঙ্গে-সঙ্গে যে হাসিটি ঝল্‌মল করে ফুটে ওঠে, তাতে বিয়ের কনের কল্পনার মত যে অক্ষয় সৌন্দর্য্যের আভা উঁকি দিতে থাকে; শ্যামার চোখের দৃষ্টি তেমনও হতে পারে। কিন্তু এতেও যে ঠিক কথাটা বলা হল না। সূর্য্যমুখী ফুল যে ব্যাকুলতা দৃষ্টিতে ভরে সারাদিন তার প্রিয়ের দিকে চেয়ে থাকে, কমলকলিকা যে গভীর দৃষ্টি নিয়ে ফুটে ওঠে, ঘাসের বনের ছোট ফুলগুলি যেমন মিষ্টি হাসি হেসে সব অপমান সহ্য করে, শ্যামা বোধ হয় তার চোখে এই সবেরই মিলন ঘটিয়েছিল।

এই শ্যামা একদিন হঠাৎ তার নতদৃষ্টি উঁচু করে আকাশের দিকে চাইল। সেখানে সে যে কি দেখ্‌লে তা কে জানে, তার দৃষ্টি আর তুচ্ছ ধরার দিকে ফিরে আস্‌তে চায় না ! শ্যামার ঘরের থেকে অনেক উপরে কোন এক সাত-শ তলার ঘরে

সুনীলের বাস ছিল। কবে থেকে যে সে সেখানে ার বেঁচে ছিল তা বলা যায় না, কারণ তার চেহারা দেখে বয়স ঠিক করা একটু শক্ত। পোষাকে তার বৈরাগ্যের লক্ষণ কোনো দিন দেখা যায় নি, কিন্তু বয়স যে তার একেবারেই হয় নি, এটাও সব সময় মনে হয় না। ফিকে নীল রঙের বসনখানিই সে সব সময় গায়ে জড়িয়ে থাকৃত, কিন্তু সময় সময় ঘন নীল বাসের উপর হীরের মালা দুলিয়ে সে একেবারে বর সেজে বস্‌ত! ছোট বড় অনেক প্রদীপ তার সভা উজ্জ্বল করে ত। এই যে সুনীল, এর মেঘের মত ঘন গুচ্ছ গুচ্ছ নরম হাল্কা একমাথা চুল ছিল, কিন্তু সে চুল কখনও 'শরৎ-শেষের মেঘের মত' তুষারশুভ্র হয়ে উঠ্‌ত আবার কদিন যেতে না-যেতেই কি এক মায়ার খেলায় বুড়োর মাথা ভরা পাকা চুল বর্ষার সজল মেঘের মত ঘোরাল হয়ে যেত।

শ্যামা যেদিন সুনীলকে দেখে অমন অবাক হয়ে চেয়ে রইল, সেদিন সুনীলের চোখও কোন্ অজানার টানে নীচু হয়ে শ্যামার দিকে চাইল। শ্যামা হেসে বল্‌লে, "ওগো নীল-সাগরের নূতন বন্ধু,

অত উপরে কেন? নীচে এস না। একলাটি নিজের ঘরে আমি কতদিন বসে থাক্‌ব? তুমিও ত দেখ্‌ছি একলাই থাক, নেমে এস, দুজনে ঘর বেঁধে একসঙ্গে আনন্দে দিন কাটাব।”

সুনীল তার কথা শুনে নিজের শক্তির অভাবের কথা মনে করে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌ল। কি আর করে, যা হোক একটা উত্তর ত দিতে হবে! সেও একটু হেসে, বল্‌লে, “আমি যে ভাই ঘর ছেড়ে নীচে যেতে পারি না। আমার হীরে মাণিক অনেক আছে বটে, বাড়ীও সাত-শ তলার উপরে, কিন্তু আমার ক্ষমতা এত কম যে একটু নীচে নাম্‌তেও পারি না। তুমিই না হয় উপরে উঠে এস। আমার ঘরে অনেক জায়গা আছে, তোমার কোনো কষ্ট হবে না।”

শ্যামার হাসি শুকিয়ে এল, সে বল্‌লে, “আমিও ভাই উপরে উঠ্‌তে পারি না, আমায় এই মাটির পৃথিবীতেই চিরকাল কাটাতে হবে।”

কথা বল্‌তে বল্‌তে শ্যামার গলা কেঁপে এল। দুঃখে অভিমানে মুখ ভার করে সে চুপ করে বসে রইল। শ্যামার দিকে চেয়ে চেয়ে সুনীলের মুগ্ধ

দৃষ্টি ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে এল। ক্রমে রাগে তার দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠ্‌ল; একি অন্যায় জগতের নিয়ম! চিরকাল এম্‌নি বন্দী হয়ে দুজনকে থাক্‌তে হবে? এত দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পরে যে সাথের সাথীর দেখা পেল, সে কেন চিরসাথী হতে আস্‌বে না? রাগে সুনীলের ইচ্ছা হচ্ছিল চোখের দৃষ্টিতে শ্যামাকে ভস্ম করে ফেলে। কিন্তু কি কর্‌বে বেচারী শ্যামা? সেও যে ধরার বাঁধন কাটিয়ে আস্‌তে পারে না। বন্দিনী শ্যামার দুঃখে বন্দী সুনীল ব্যথিত হয়ে বিষণ্ণ মুখে ঝুঁকে পড়ে তার করুণ কোমল মূর্ত্তিটি দেখ্‌তে লাগ্‌ল। তার হাওয়ার মত হাল্কা উত্তরীয়খানি দুলে দুলে গিয়ে শ্যামার চুলের উপর পড়্‌ল। শ্যামার মনে হল, ওই অত উপর থেকে যেন তার সুদূরের নূতন বন্ধুর স্নেহস্পর্শ উত্তরীয়ের উপর ভর করে ভেসে এসে তার মাথায় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করে যাচ্ছে। যেন বলে যাচ্ছে, বন্ধু, তোমার মুক্তি হোক্।

শ্যামা তখনও তেমনি করেই চেয়ে রইল। সারাদিন চোখের পলক না ফেলে সুনীলের ক্লান্ত চোখ ঢুলে আস্‌ছিল। সে ঘুমে দৃষ্টি ভরে বিদায়ের

মধুর হাসি হেসে তেমনি একটু নত মুখে সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। শ্যামার স্বপ্ন তার ঘুমন্ত মুখের উপর সোনার রঙে কত ছবি এঁকে দিয়ে গেল।

এম্‌নি করে কত দিন যায়। প্রতিদিন সকাল হতে না-হতে তুজনে তুজনের দিকে চেয়ে গল্প জুড়ে দেয়। শ্যামা হাত-তুলিয়ে ডাকে "এস, এস।"

সুনীল কোঁকড়া চুলের গোছা নেড়ে বলে, "না, গো, না, যেতে পারব না।"

দিনের পর দিন একটানা বসে বসে গল্প করে, একদৃষ্টে সুনীলের প্রখর দৃষ্টির দিকে চেয়ে থেকে শ্যামা যেন শুকিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অযত্নে আর ধূলার অত্যাচারে তার স্নিগ্ধ সবুজ শাড়ীখানি গেরুয়া হয়ে গেল, তার চুল ঝরে পড়ে যেতে লাগ্‌ল, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এল।

সুনীল সজল চোখে চেয়ে বল্‌লে, "শ্যামা ভাই, কি হয়েছে তোমার? অমন সোনার প্রতিমা এমন হলে চল্‌বে না ত।"

তার ইচ্ছা কর্‌ছিল শ্যামার গায়ে হাত বুলিয়ে তার সব তুঃখ দূর করে দেয়। কিন্তু শক্তি যে নেই। তুঃখে সুনীলের চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল

ঝরে শ্যামার আঁচলে শ্যামার চুলে ছড়িয়ে পড়্‌ল। শ্যামা ক্ষীণ কণ্ঠে ডেকে বল্‌লে, "জল দাও ভাই, আমি তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেলাম।"

মহা উৎসাহে ছুটে গিয়ে সুনীল হুড়্‌মুড়্‌ দুড়্‌দুড়্‌ করে ঘরের সোনার ঝারি কলসী উল্‌টে ফেলে শ্যামার চোখ ঝল্‌সে দিয়ে কি একটা আগুনের মত পিচ্‌কারি করে উপর থেকে হাজার ধারায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে লাগ্‌ল।

সেই জলে স্নান করে আকণ্ঠ পান করে শ্যামার চেহারা ফিরে এল, তার চোখের চাউনি ঢল্‌ঢলে হয়ে উঠ্‌ল।

তার পর দিনে দিনে শ্যামার ঘরের চারি ধারে কত জীবজন্তু সুনীলের দৃষ্টির তলায় ঘর বাঁধ্‌লে। তারা সবাই শ্যামার কোলের ছেলের মত তার কাছে সহস্র আব্‌দার জুড়ে দিলে। তাদের নিয়ে শ্যামার দিন একরকম মন্দ কাট্‌ত না। কিন্তু সে যাকে চেয়েছিল, তাকে ত পায়নি, কাজেই তার চিরদিনের ব্যাথাটা বুকের মধ্যে লুকিয়েই রইল। সে ব্যথায় সে এখনও তেমনি শুকিয়ে ওঠে, তার দুঃখে সুনীলের চোখের জল এখনও তেমনি করে ঝরে পড়ে।

শ্যামার নূতন সাথাদের মধ্যে একজন ছিল তরুণ। তরুণের হাতে একটা বাঁশের বাঁশী, গায়ে বাসন্তী রঙের চাদর, গলায় রজনীগন্ধার মালা। সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, মনের মধ্যে তার কত ছন্দ কত গান থেকে থেকে জেগে ওঠে, কিন্তু সুর ধরে বাইরে তারা কেন জানিনা ফুটে ওঠে না। বাঁশীর কানে সে তার সেই সুর ঢেলে দিতে চায়, কিন্তু বাঁশী দুঃখের সুরে ব্যথার রাগিণীতে মাঝে মাঝে কেঁদে ওঠে বটে, কিন্তু আনন্দের ঝঙ্কার তাতে কিছুতেই বেজে ওঠে না।

তরুণের এ দুঃখ সহ্য হত না। সে ভাব্‌ত—কেন এমন হবে? আনন্দ কি জগতে নেই? কেবল দুঃখের কান্নাই কেন গাইব?

শ্যামার কাছে তরুণ তার দুঃখের কথা নিবেদন করলে। সেই যে আনন্দ, যাকে সে সারা জগৎ খুঁজে বেড়াচ্ছে, কেন তাকে সে পাবে না?

শ্যামা বল্‌লে—"ওরে পাগল, যে শ্যামা আঁচল দিয়ে তোদের ঢেকে রেখেছে, যার হাতের অন্ন খেয়ে মানুষ হলি, সে যে দুঃখ ছাড়া আর কিছু

জানে না! যে সুনীলের চোখের আলোয় তোদের ঘরে আলো জ্বল্‌ছে, সেও যে বড় দুঃখী, দুঃখই যে তোদের ঘিরে রেখেছে। দুঃখের মাধুরীই তোর বাঁশীর সুরে বাজ্‌বে।"

পাগ্‌লা তরুণ বল্‌লে,—"সে কিছুতেই হবে না। ব্যথায় যখন আমাদের, প্রথম দৃষ্টি মেলেছি, তখন ব্যথার বাঁশী ত বাজ্‌বেই, কিন্তু আনন্দ চাই। এই যে তোমার কোলের ছেলেমেয়েগুলি, এরা সারাদিন বেদনার সঙ্গে, বিচ্ছেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, সন্ধ্যায় ব্যথাভরা চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ে। এরা তোমার হাতের অন্নের সঙ্গে-সঙ্গেই এ-সব পেয়েছে জানি, কিন্তু আনন্দ আমি এদের দেবো, মিলনও এনে দেবো। বলো তুমি সে আনন্দ কোথায় পাবো, মিলনই বা কোথায় ঘট্‌বে। তুমি তোমার দুঃখের সাথী আমাদের করেছ, আমরা আমাদের সুখের সাথী তোমায় কর্‌ব।" শ্যামা বল্‌লে, "যাও সুনীলের কাছে। কোথায় আনন্দ আছে সে বলে দেবে আর পারো ত সুনীলকেও সেই আনন্দের সাথী করে নিও।"

পাগ্‌লা তরুণ সুনীলের সাত-শ তলার ঘরে গিয়ে

ধাক্কা দিলে। সুনীল ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে বল্‌লে "কে গো তুমি পথিক ? কি চাও ?" তরুণ উত্তর দিলে, "আনন্দ চাই, দিতে পার্‌বে ?"

সুনীল ত অবাক ! আনন্দ কোথায় পাবে সে ? দুঃখই ত তার সম্বল। তরুণ ছাড়্‌বার পাত্র নয়। সে বল্‌লে, "তুমি সন্ধান বলে দাও। আমি সংগ্রহ করে আন্‌ব। এনে তোমাকেও ভাগ দেবো।"

সুনীল চোখ খুব বড় করে একবার চারদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বল্‌লে, "দেখ্‌ছি ধূলিকণার মত আনন্দরেণু জগতে ছড়িয়ে আছে; তোমায় কুড়িয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে। সব জায়গাতেই আছে, তোমার চোখে সবই ধরা পড়্‌বে। যাও কণা-কণা করে খুঁটে আনো।"

তরুণ চলে গেল। নেমে গিয়েই দেখ্‌লে বনের হরিণের চোখের দীপ্তিতে আনন্দ এককণা ফুটে আছে। চাইতেই তারা তার ভাগ দিলে।

তারপর বন পার হয়ে পথের শিশুর হাসি থেকে, ঘরের বধূর প্রতীক্ষা থেকে, কুমারীর কল্পনা থেকে, ফুলের রূপ থেকে, কণা-কণা করে আলো আর আনন্দ নিয়ে বাসন্তী চাদর বোঝাই করে তরুণ এসে

সুনীলের দরবারে হাজির। কিন্তু এত আনন্দ সে রাখে কোথায় ?

সুনীল আবার বাড়ী উলট্‌পালট্‌ করে খোঁজ করতে সুরু করলে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বেরুল একটা প্রকাণ্ড শূন্য সোনার প্রদীপ। তরুণ ছুটে গিয়ে সেইটা তুলে নিয়ে তাতে তার সমস্ত আহরণ উজাড় করে ঢেলে দিলে।

আনন্দের আলো পেয়ে শূন্য প্রদীপ জ্বলে উঠল। তখন রাত্রি হয়েছে। ঘরে ঘরে ক্লান্ত মানুষগুলি ঘুমিয়ে পড়েছে। শ্যামার আঁচল তাদের সকলকে বাতাস দিয়ে দিয়ে গভীর ঘুমের কোলে শুইয়ে দিচ্ছিল। সারাদিনের দুঃখ তখন তারা ভুলে গেছে। গত দুঃখের পরে আবার আগামী দুঃখের সময় জেগে উঠতে হবে, তাই মাঝপথে তারা একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছিল।

এমনি সময় সমস্ত আকাশ পৃথিবী পূর্ণ করে আনন্দ-প্রদীপের আলো ছড়িয়ে পড়ল। শ্যামার চোখে মুখে সে আলোর রেখা পড়ে তার সমস্ত হারানো রূপ ফুটে উঠল, সঙ্গে-সঙ্গে নূতন রূপের শিখা যেন তাকে ঘিরে নেচে উঠল। শ্যামার সমস্ত

শরীর হাওয়ার মত হাল্কা হয়ে গেল; আনন্দের স্রোতের উপর সে ক্রমে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তার মনে হচ্ছিল তার ধরার বাঁধন আজ খসে গেছে, যেন সে আলোর ডানায় ভর করে সুনীলের ঘরের দিকে উড়ে চলেছে।

ঘরের সোনার চূড়ার উপর আনন্দ-প্রদীপ স্নিগ্ধ আলোর ছটা ছড়িয়ে জ্বলে উঠ্‌তেই সুনীল আনন্দে পাগল হয়ে উঠ্‌ল, এ নূতন আলোর প্রভায় তার হীরার মালা ম্লান হয়ে গেল। কিন্তু আজ আর তাতে দুঃখ নেই। আজ যে তার শ্যামা তার ঘরে উড়ে আস্‌ছে। ব্যস্ত হয়ে সুনীল ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়্‌ল। তারও বাঁধা-নিয়মের নিগড় আজ টুটে গেছে। অবাধে সে ধরার দিকে নেমে চল্‌ল শ্যামাকে তুলে আন্‌তে। মাঝপথে দুজনের দেখা হল। সোনার প্রদীপের আলোয় শ্যামার সবুজ শাড়ী সুনীলের নীলাম্বরের সঙ্গে মিলে মিশে যেন একাকার হয়ে গেল। যেখানের যত রং, যত আলো, সব মিলে আজ নূতন প্রদীপের রূপোলি আলোয় গলে এক হয়ে গেল। সবই সেই এক রঙে রঙীন।

ঘরের কোণে যে শ্রান্ত মানুষগুলি ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ কি একটা অজানা আনন্দের স্পর্শে তাদের শ্রান্তি এক নিমিষে ঘুচে গেল ; কোমল মৃদু আলোর রেখা তাদের চোখের পাতায় পড়ে ঘুম লুটে নিয়ে চলে গেল। তারা জেগে উঠে ঘরের বাইরে এসে দেখ্লে তাদের দুঃখিনী শ্যামার মুখের হাসি আজ মুক্তোর মত ঝরে পড়্ছে, তার কোমল হাত দুখানি আজ সেই সাত-শ তলার সুনীলের হাতের মধ্যে ফুলের মত পড়ে আছে, আর আকাশের নূতন আলো তাদের মুখ দুখানির উপর পড়ে এক রঙে রঙিয়ে দিয়েছে।

সবাই জেগে উঠ্তেই তরুণের বাঁশী আনন্দে তার গোপন ভাণ্ডারের সমস্ত আনন্দগান বাতাসের গায়ে ছড়িয়ে দিলে।

সেই যে আলো সেই ত জ্যোৎস্না। মরা চাঁদকে সেই রূপ ধার দিয়েছে, মানুষের আনন্দ-মিলনের শুভলগ্ন সেই স্থির করে দিয়েছে।



ময়না

অনেককাল আগে পচম্বার কয়লার খনিগুলির কাছাকাছি একটা জায়গায় খনির কুলি মজুর কণ্ট্রাক্টর কেরানী বাবু প্রভৃতিকে নিয়ে একখানি ছোটখাটো গ্রাম গড়ে উঠেছিল। গ্রামটি লোক-সমাজের চোখের একেবারে বাইরে। ছোট ছোট নদী, শিউলিবনে-ঢাকা পাহাড়ের টিবি আর বড় বড় শালবনে মিলে তাকে এমন করে লুকিয়ে রেখেছিল যে অনেক চেষ্টা করলেও বাইরের জগৎ কি লোক-সমাজ তাকে আপনার গণ্ডীর ভিতর আনতে পারত না। গোধূলির ম্লান লাল আলো যখন সেই গ্রামের ছোট ছোট খোলার বাড়ীগুলির উপর ছড়িয়ে পড়ত, তখন গ্রামখানিকে দেখে মনে হত যেন মূর্ত্তিমতী সন্ধ্যালক্ষ্মী। সে গ্রামের ছোট ছোট রাঙা বাঁকা পথগুলি মাঝে মাঝে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আবার কিছু দূর থেকে উঁকি মেরে দেখা দ্যায়। সেই-সব পাহাড়ের গা দিয়ে আর তলা দিয়ে অনেক-গুলি ক্ষীণস্রোতা ছোট ছোট নদী ঝিক্‌মিক্ করে। তাদের জলের তুলনায় বালির রাশিই বেশী। কচি

মেয়ের মত পথ আর নদীগুলি যেখানে লুকোচুরি খেলায় ব্যস্ত, সেখানে পাহাড়গুলি বুড়ী সেজে চিরগম্ভীর মূর্ত্তি ধরে বসে থাকে; তারা কখনও টলে না। গ্রামের কিছু দূরে অনেকগুলি খোয়াই আর খাদ ক্ষুধিত দৈত্যের মত হাঁ করে পড়ে ছিল। তাদের মুখের ভিতর হীরার মতন ঝক্‌ঝকে অসংখ্য পাথরের দাঁত।

গ্রামে অর্থের সন্ধানে নানাদেশের নানালোক এসে জুটেছিল। বাঙালী, হিন্দুস্থানী, ছোটনাগপুরী —সবরকম মানুষই সেখানে মজুত। গোবর্দ্ধন সরকার নামে এক প্রায় নিরক্ষর বাঙালী এই গ্রামে এসে বেশ ধনী হয়ে উঠেছিল। প্রথম যেদিন তাকে এখানে দেখা যায়, সেদিন তার সম্বল ছিল কেবল একটি হুঁকো, একটি ছাতা আর একটি ক্যাম্বিশের পেটে-আঁতে-লাগা ব্যাগ, উপ্‌রি একটি সুপুষ্ট পিলে। কুলির কাজে হাত দিয়ে চঞ্চলা লক্ষ্মীর কৃপায় আর নিজের বুদ্ধি ও হিসাবের জোরে সে অনেক ব্যবসা ফেঁদে বস্‌ল।

শেষকালের ব্যবসাটিই হল তার কাল। গোবর্দ্ধনের বাড়ীর সাম্‌নে একখানা মস্ত লম্বা

খোলার ঘর। রোজ সন্ধ্যা ছটার সময় যখন কয়লাখনির চিম্‌নিতে তীব্র স্বরে ছুটির বাঁশী বেজে উঠ্‌ত, তখন শ্রান্তক্লান্ত কুলি-মজুরের দল কয়লার গুঁড়ো মেখে ঘামে সারা অঙ্গ ভিজিয়ে পাহাড়ের গায়ের সরু বাঁকা পথগুলি বেয়ে হিন্দি-বাংলা-মেশানো অপূর্ব্ব খিচুড়ী গান গাইতে গাইতে তার সেই ঘরখানায় এসে হাজির হত। পরিবারহীন কুলিরা এইখানেই সন্ধ্যা বেলার আহারটা সেরে যেত; সেইসঙ্গে অল্পবিস্তর মদও খেতে ভুল্‌ত না। এই সুযোগে গোবর্দ্ধন কিছু টাকা করে নিচ্ছিল। কিন্তু বিধি এবার বাম। লোককে মাতাল করতে গিয়ে নিজেও মদ ধরে গোবর্দ্ধনও রীতিমত মাতাল হয়ে উঠ্‌ল। এখন সে গ্রামের লোকের কল্যাণে মাতাল গোব্‌রা নামেই সুবিখ্যাত।

গোবর্দ্ধনের পতন সুরু হল বটে, কিন্তু গ্রাম বেড়েই চল্‌ল। মানুষ বাড়্‌লেই তাদের সভ্য কর্‌বার জন্যে একদল লোক জুটে যায়; কোথা থেকে এক খৃষ্টান পাদ্রী এসে একখানা ঘরে গির্জ্জা খুলে বস্‌ল। গ্রামের স্ত্রী পুরুষ মদ খেয়ে এক-সঙ্গে মাত্‌লামি করে, ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন

গালাগালি মারামারি করেই কাটায়, এদের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা দরকার। কাজেই পাদ্রীমশায় প্রতি রবিবার তাদের ধরে লম্বা লম্বা উপদেশ দিতে লাগ্‌লেন। পরকাল সম্বন্ধেও অনেক ভয় দেখাতে ছাড়্‌লেন না। গ্রামের মাঝখানে একখানা আট-চালা ঘরে এক পাঠশালা বস্‌ল। দুঘর খৃষ্টান ভদ্রলোকও গ্রামের অধিবাসী হলেন।

পাঠশালার তরুণ শিক্ষকটির নাম ছিল নবীন। কিন্তু পোড়োর দল তাঁকে মাষ্টার বলেই ডাক্‌ত। একদিন রাত্রে পাঠ্‌শালার ঘরে মাষ্টার এক্‌লাটি বসে এক বোঝা বালি-কাগজের খাতা নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌ছিলেন। বড় বড় কাঁচা অক্ষরে হিজিবিজি কত কি লেখা; মাষ্টার যথাসাধ্য সেগুলিকে সভ্য করে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন, এমন সময় দরজার গায়ে আস্তে আস্তে টক্‌ টক্‌ করে শব্দ হল। সারাদিন কাকে তাঁর চালের খোলা উল্‌টে উল্‌টে অনেক শব্দ করেছে, তাতে তাঁর কাজের কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি, কিন্তু দরজা ঠেলে ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে যখন অভ্যাগতটি শিকল ঠক্‌ঠক্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল তখন তার দিকে না তাকিয়ে

আর উপায় কি ? ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে, একটা তেলচিটে লাল আঙিয়া গায়ে, এলো-থেলো চুলে একটি ছোট মেয়েকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখে মাষ্টার প্রথমটা চম্‌কে উঠেছিলেন। কিন্তু একটু পরেই মনে পড়্‌ল, ঐ ডাগর কালো চোখ দুটি, ঐ রোদে-পোড়া তাঁমাটে মুখখানি, ঐ রুক্ষ ঝাঁকড়া কালো চুলের রাশি, ঐ লাল-ধূলামাখা ছোট ছোট হাত-পাগুলি, সবই ত তাঁর পরিচিত। এ ত গোবর্দ্ধন সরকারের মাতৃহীনা কন্যা ময়না।

ময়নাকে সে গ্রামের সবাই চিন্‌ত। গ্রামের চারি প্রান্তে এমন কোনো স্থান ছিল না, যা তার অগম্য। মাষ্টার ভাব্‌লেন "এমন সময় ময়নার এখানে কি দর্‌কার ?" ময়না ভয়ানক দুর্দ্দান্ত মেয়ে। কার সাধ্য তাকে পোষ মানিয়ে নরম করে রাখে। ময়নার বাবার দুর্ব্বল চরিত্র আর রণচণ্ডী ময়নার খেয়াল পাগ্‌লামি ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব গ্রামে প্রায় প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ময়না পাঠশালার ছেলেদের সঙ্গে সমানে মারামারি আর কুস্তি কর্‌ত ; উপ্‌রি তাদের নানা রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ কর্‌তেও ছাড়্‌ত না। কাঠুরিয়া শালবনে

কাঠ কাট্‌তে গেলে ময়না তাদেরও সঙ্গী। কত প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিন মাষ্টার ময়নাকে খালি পায়ে খালি মাথায় তপ্ত বালির চরের উপরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। নদীর ধারে কুলিদের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বাঁধা। ময়নার শুক্‌নো মুখখানি দেখে অনেক সময় সেখানকার মেয়েরা তার ক্ষুধা পিপাসা দূর কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ত। এই-সব যেচে-দেওয়া দানেই ময়নার নিরুদ্দেশ যাত্রার সময়কার সমস্ত অভাব দূর হত। এর বেশী দয়াও যে ময়নাকে কেউ কোনো দিন করেনি তা নয়। এই দুরন্ত বুনো ময়নাটিকে মানুষ নামের যোগ্য করে তোল্‌বার ইচ্ছায় পাদ্রী মহাশয় কুলিদের হোটেলে তার একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ময়না কি বাগ মান্‌বার মেয়ে? একটু রাগ হলেই সে হোটেল-ওয়ালাকে ঘটী বাটি ছুঁড়ে মার্‌তে সুরু করে দিত, কেউ কিছু ঠাট্টা কর্‌লে তারও নিস্তার ছিল না। আর নীতি-বিদ্যালয়ে গিয়ে সে এমন বিদ্রোহ বাধিয়ে বস্‌ল যে ক্ষমা-ধর্ম্মের প্রচারক খৃষ্টীয় পাদ্রীকেও অক্ষমার শরণ নিতে হল। ময়নার উৎপাতে ছেলে-মেয়েদের জামা কাপড় আস্ত

থাক্‌বার জো ছিল না, আর নীতিশিক্ষা যা হ'ত তা বলাই বাহুল্য। কাজেই, পাদ্রী মহাশয় তাকে প্রায় কান ধরেই বার করে দিতেন। তার ছেঁড়া কাপড়, জটাবাঁধা চুল আর ক্ষতবিক্ষত পা দুখানি দেখ্‌লেই তার স্বভাব আর কীর্ত্তিকলাপের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ময়নাকে দেখে মাষ্টারের একটু দয়া হল। তার ঝক্‌ঝকে কালো চোখের নির্ভীক দৃষ্টি তাঁর মনে একটু শ্রদ্ধারও উদ্রেক করে তুল্‌লে।

মাষ্টারের মুখের উপর চোখ রেখে ময়না নির্ভয়ে গড়্‌-গড়্‌ করে অনেকগুলো কথা বলে গেল—"তুমি একলা আছ বলেই আমি এখন এলাম। তোমার পোড়োগুলো থাক্‌লে আমার একটুও আস্‌তে ইচ্ছে করে না। ওগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না। আচ্ছা, তুমি এখানে পাঠ্‌শাল কর, না? আমিও পড়্‌ব।"

ময়নার কাপড় চোপড় আর চেহারা দেখে লোকের মনে দয়া হওয়াই স্বাভাবিক। তার উপর দু ফোঁটা চোখের জল ফেল্‌লে ত কথাই নাই; তবে ওতে মনটা নরম হওয়া ছাড়া আর বড় বেশী কিছু হত না। কিন্তু ময়নার রুদ্র মূর্ত্তিই কোন্

ফাঁকে মাষ্টারের মনে শ্রদ্ধাকে ডেকে আন্‌লে। বিচার করে দেখ্‌লে হয়ত লোকে বল্‌ত এখানে শ্রদ্ধা করা উচিত নয়। কিন্তু মন জিনিসটাকে মোটেই ভাল বিচারক বলা চলে না। কোনোখানে নূতনত্বের খোঁজ পেলেই তার চিরনবীন প্রাণ আপনার অজ্ঞাতেই আপনার শ্রদ্ধাটুকু সেখানে সঁপে বসে।

কপাটের শিকলের ভিতর আঙুলগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে মাষ্টারের অনিমেষ দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রেখে ময়না তখনও একটানা নদীর স্রোতের মত বকে চলেছে,—"আমার নাম হল গে ময়না, ময়না সুন্দরী দাসী। সত্যি বল্‌চি, মা কালীর দিব্যি, আমার নাম ময়না। আর বাবার নাম গোবর্দ্ধন সরকার, ঐ যে গো সেই মাতাল বুড়োটা, গোব্‌রা, গোব্‌রা, বুঝেছ এবার? ময়না দাসী, মনে থাক্‌বে ত নামটা? আমি পাঠ্‌শালে নেকাপড়া কর্‌তে আস্‌ব।"

মাষ্টার বল্‌লেন, "তা বেশ ত!"

ময়নাকে রাগিয়ে ক্ষেপিয়ে তোল্‌বার জন্যে সকলে তার সব কাজেই বাধা দিত, সব কথাতেই অমৃত করে বস্‌ত। এমন কি অনেক সময় বেশ নির্দ্দয় ব্যবহার পর্য্যন্ত কর্‌ত। তারও যে একটা

হৃদয় আছে, সেটা লোকে ভুলেই গিয়েছিল। সেই থেকে বাধা পাওয়াটাই ময়নার কাছে একান্ত স্বাভাবিক বলে মনে হত। এখন মাষ্টারকে অমন সহজে তার কথায় সায় দিতে দেখে সে ত অবাক্। কথা বলা থামিয়ে নিজের এক গোছা চুল নিয়ে সে নিঃশব্দে আঙুলে জড়াতে লাগ্ল। প্রথমে সে দাঁত দিয়ে শক্ত করে ঠোঁটটা চেপে দাঁড়িয়ে ছিল, অল্পে অল্পে সে ঠোঁট দুখানির বাঁধন খুলে কিসের আবেগে যেন একটু কেঁপে উঠ্ল। ময়নার দৃষ্টি ক্রমে নেমে এসে পড়্ল তার পায়ের নখের উপর। এত কালের রোদে-পোড়া তামাটে গাল দুটিরও যেন লজ্জায় লাল হয়ে ওঠ্বার চেষ্টা। হঠাৎ মাষ্টারের মাদুর-খানার উপর আছ্ড়ে পড়ে তার যা কান্না "ওগো যমে আমায় ভুলেছে কেন গো।" সে কান্নার আর যেন শেষ নেই। কাঁদ্তে কাঁদ্তে ক্রমশঃ সে নির্জ্জীব হয়ে পড়্ল। সে কান্না শুন্লে মনে হয় তার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি দুঃখের ভারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

তার কান্নার বিরাম নেই দেখে মাষ্টার তাকে তুলে বসিয়ে নিজেও তার পাশে চুপ্টি করে বসে রইলেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটু পরে সে আবার

কি সব বল্‌তে সুরু করলে, “আমি লক্ষ্মী মেয়েই হব, আমি ভাল মেয়ে হব, ওগো আমি ত কিচ্ছু......”

তাকে কথা বল্‌তে শুনে মাষ্টারের সাহস হল, তিনি বল্‌লেন, “তুমি পাদ্রী সাহেবের ইস্কুল ছেড়ে দিলে কেন ?”

ময়না বল্‌লে, “পাদ্রী আমায় বলে কি না, ‘তুমি দুষ্ট বালিকা, পরমেশ্বর তোমাকে ঘৃণা করিবেন।’ কেন ও আমায় অমন করে বল্‌বে ? আমাকে ওর পরমেশ্বর দেখ্‌তে পারেন না, আমি কেন সেখানে যাব ? কখ্‌খনো যাব না। কালী মাঈর দিব্যি যাব না, যীশুর দিব্যি যাব না। যে আমায় ঘেন্না করে তার কাছে আমি যাই না।”

“এম্‌নি করে তুমি তাঁকে বলেছিলে ?”

“হ্যাঁ, বলেছিলুম না ত কি ?”

ময়নার কথা শুনে মাষ্টার হেসে উঠ্‌লেন। বাইরে তখন শাল গাছের সারির ভিতর দিয়ে ক্রুদ্ধ পবন সাঁ সাঁ করে ছুটে বেড়াচ্ছিল ; এমন সময়ে ছোট খোলার ঘরখানায় নবীনচন্দ্রের প্রাণ-খোলা অট্টহাসিটা বড় বেখাপ্পা শোনাল। তখনই একটি

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি হাসির ভুলটা সেরে নিলেন। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাষ্টার ময়নার বাবার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

ময়নার মুখ চোখ ফেটে কথাগুলো ঝড়ের মত ছুটে বেরিয়ে পড়্‌তে চায়। তার বাবা? বাবা আবার কে? সে ওর জন্মে কবে কি করেছে? কার জন্যে পাড়ার মেয়েগুলো ময়নাকে অমন করে নাক সিঁট্‌কোয়? পথ চল্‌তে দেখ্‌লে লক্ষ্মীছাড়ীরা "ঐরে গোব্‌রা মাতালের মেয়ে" বলে চেঁচিয়ে অস্থির করে। বল্‌তে বল্‌তে ময়নার শোক উছ্‌লে উঠ্‌ল; "ওগো মাগো! আমি কেন মরি না গো! ওগো যম কি পথ ভুলে গেছে? সবাই মরে, কেবল আমিই মরি না। আমি এখ্‌খুনি মর্‌ব, এখ্‌খুনি মর্‌ব।" বলে ময়না মেজেয় মাথা খুঁড়্‌তে লাগ্‌ল। তার কান্না আর থামে না।

শিশুর মুখে অমন অস্বাভাবিক কথা শুনে মাষ্টার তাকে আর-সকলেরই মত করে বোঝাতে লাগ্‌লেন। কিন্তু তার ছিন্ন বেশ আর মাতাল পিতার মূর্ত্তিটি তোমার আমার মত তিনি ভুলে যাননি। ময়নার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে মাষ্টারের

সে কত কথা! তারপর তাকে ঘরে তুলে, কাপড় জামা ঝেড়ে, চুলগুলি চোখের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে তাকে কাল পাঠশালায় আস্‌তে বলে দিলেন। গ্রাম্য পথের অনেকখানি পর্য্যন্ত ময়নার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে মাষ্টার তাকে বিদায় দিলেন। তাদের সাম্‌নের সরু পথটিতে তখন চাঁদের আলো এসে পড়েছে। ময়না চলে গেল; মাষ্টার তার দিকে তাকিয়েই আছেন। মেয়েটি মাথা নীচু করে চল্‌তে চল্‌তে মনসা-কাঁটার বেড়া-দেওয়া গ্রামের গোরস্থানের পাশের পথে এসে পড়্‌ল, সেইখানে পথটি বেঁকে পাহাড়ের আড়ালে চলে গিয়েছে। ময়না বাঁকের কাছে একবারটি দাঁড়াল। আকাশের গায়ে কত উঁচুতে তখন শান্ত তারাগুলি জ্বল্‌ছে আর নীচে ঐ ছোট্ট মেয়েটি বেদনার ছায়ামূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে। মোড় ফির্‌তেই ময়না অদৃশ্য হয়ে গেল, মাষ্টারও আপন কাজে পাঠশালায় ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর মন আর কাজে ভিড়্‌ছে না। তাঁর ঝাপ্‌সা চোখে বালি-কাগজের খাতার উপর ছেলেদের টানা আঁকা বাঁকা লাইনগুলি সারি সারি সীমাহীন গ্রাম্যপথ হয়ে উঠ্‌ল, কত বিষণ্ণ শিশু-মূর্ত্তি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তারই

উপর দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পাঠশালার আটচালা ক্রমশঃ এমনি নির্জ্জন ঠেক্‌তে লাগ্‌ল যে মাষ্টার সহ্য কর্‌তে না পেরে দরজা বন্ধ করে বাড়ী চলে গেলেন।

পরদিন সকালে ময়না পাঠশালায় হাজির। আজ তার মুখখানি একটু ধোয়া মোছা, চিরুনির সঙ্গে যুদ্ধ করে চুলগুলিও খানিকটা বাগে এসেছে। চোখে আজও মাঝে মাঝে আগুনের হল্‌কা দেখা দিচ্ছিল, কিন্তু ব্যবহারটা অনেক 'ধীর ও শান্ত হয়ে এসেছে।

নূতন ছাত্রী ময়না আসায় মাষ্টারের জীবনের ধারা যেন একটু বদ্‌লে গেল। এ ছাত্রীটি মাষ্টারকে ঠিক তার আসনটি দেয় না। তার দাবীও বেশী, অত্যাচারও বেশী। কাজেই মাষ্টার আর ছাত্রী দু-জনকেই অনেক পরীক্ষা আর স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে চল্‌তে হয়। ফলে দুজনের মধ্যে একটা বিশ্বাস ও মমতার যোগ স্থাপিত হল। মাষ্টারের সাম্‌নে ময়না খুবই বাধ্য, কিন্তু একটু অবজ্ঞা কি অবহেলা কল্পনা করেই সে আড়ালে মহা অনর্থ বাধিয়ে তুল্‌ত। মাঝে মাঝে ময়নাকে জ্বালাতন

করতে গিয়ে, যুদ্ধে তার কাছে হার মেনে, দুর্দ্দান্ত ছাত্রেরা সমস্ত মুখে নখের আঁচড় আর সারা অঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন কাপড় জামা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ময়নার নামে মাষ্টারের কাছে নালিশ করতে আসত। তখন সে বেচারার মাথা ঠাণ্ডা রাখা দায়। ময়নার অত্যাচারে লোকে সে পাঠশালায় আর ছেলেমেয়ে পাঠাতেও ভয় পেতে লাগল। যাদের সে ভাবনা নেই, তাদের কথার সুর একটু অন্য রকম। তারা বলে, "আহা তবু ত নবীন মাষ্টার মেয়েটার একটা গতি করে দিলে!" তাদের ধন্যবাদে তরুণ মাষ্টারের মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

সেই জ্যোৎস্নারাত্রির প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে মাষ্টারের প্রভাবে ময়নার অতীত জীবনটা ক্রমশঃ ছায়ার মত মিলিয়ে আসতে লাগল। পাদ্রীর মত ধর্ম্মশিক্ষা দেবার চেষ্টা তিনি একদিনও করেন নি। পড়ার বইএর মধ্যে কোনো কোনো কথা পড়ে কখনো কখনো আপনিই তার চোখ জলে ভরে আসত। সে অশ্রু মানুষের উপদেশে ফোটানো নয়।

২

প্রথম পরিচয়ের তিন মাস পরে একদিন সন্ধ্যা বেলা মাষ্টার খাতাপত্র নিয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় সেইদিনকার মত কপাটে ঠক্‌ঠক্ করে শব্দ করে ময়না এসে তাঁর পাশে দাঁড়াল। সেই উজ্জ্বল কালো চোখ দুটি আর লম্বা লম্বা কালো চুলগুলি না থাক্‌লে আজকার ময়নাকে সেই আগেকার ময়নার ছায়া বলেও কেউ ভুল কর্‌ত না। সে এসে বল্‌লে, "আজকে বুঝি তোমার অনেক কাজ রয়েছে?" উত্তর পাবার আগেই আবার বল্‌লে "আমার সঙ্গে একবার আস্‌বে?" মাষ্টার শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতেই সে আগেকার মত মাথা দুলিয়ে জোর দিয়ে বলে উঠ্‌ল, "তবে শীগ্‌গির উঠে এস্।"

দুজনে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়্‌লেন। গ্রাম ছাড়িয়ে এসে মাষ্টার জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "কোথায় যাবে?" সে বল্‌লে, "আমার বাবাকে দেখ্‌তে।"

আজ প্রথম ময়নার মুখে বাবা কথাটি শোনা গেল। এতদিন সে "সেই বুড়োটা" "গোবর্দ্ধন-

সরকার” “গোব্‌রা” প্রভৃতি নামেই কাজ চালাত। তিন মাসের মধ্যে আজই সে প্রথম বাবার কথা পাড়্‌লে; মাষ্টার জান্‌তেন ঐ বিষয়টা এড়িয়ে চল্‌তে ময়নার খুব চেষ্টা। তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা জেনে মাষ্টার নীরবে ময়নার পিছন পিছন চল্‌লেন্‌। মাষ্টারের হাতখানি ধরে ময়না কত খাদে খোয়াইয়ে, কত ঝোপে ঝাড়ে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগ্‌ল। বাইরের কোনো কথাই আর তখন তার মনে ছিল না, শুধু এই খুঁজে বেড়ানোর ব্যাপারটাই তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছিল। মাঝখানে শুক্‌নো খড়-পাতার আগুন জেলে এক জায়গায় কতকগুলো কুলি আগুন পোয়াচ্ছিল, ময়নাকে চিন্‌তে পেরে তারা তাকে নাচ্‌তে গাইতে অনুরোধ কর্‌লে, একজন মদ খাওয়াবার চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু ময়নার সেদিকে ভ্রুক্ষেপই নেই। কোথাও দু একটা লোক মাষ্টারকে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে। একটি ঘণ্টা কেটে গেল এম্‌নি করে। কত জায়গায় ঘুরে ফিরেও সন্ধান না পেয়ে তখন তারা একটা খাদের ধার দিয়ে ফিরে আস্‌তে লাগ্‌ল। হঠাৎ

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দূরে কিসের যেন একটা শব্দ হল। গাছপালা আর পাহাড়ের ঢিবির গায়ে লেগে শব্দের প্রতিধ্বনিও কয়েকবার দম্ দম্ শব্দ করে উঠ্‌ল। নদীর ধারের কুকুরগুলো শব্দ শুনে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিলে। এদিকে ওদিকে কয়েকটি আলোও যেন ছুটোছুটি করে চলে গেল। তাদের খুব কাছেই একটি ছোট নদী। ঝুপ্‌ঝুপ্ করে কয়েকখানা পাথর পাহাড়ের গা থেকে খসে পড়্‌ল সেই নদীর জলে। শালবনের ভিতর দিয়ে একটা দম্‌কা হাওয়া হাহা করে বয়ে গেল, যেন ক্ষ্যাপার কান্না। তারপর সব নিস্তব্ধ। সে নিস্তব্ধতা আরও নিবিড়, আরও গভীর, আরও ভীষণ। ময়নাকে সাহস দেবার জন্যে মাষ্টার ঘুরে দাঁড়ালেন। কিন্তু ময়না ত নেই। কোথায় উড়ে গেল? ভয় পেয়ে মাষ্টার নদীর ধার দিয়ে খানা খন্দ ডিঙিয়ে ছুটে চল্‌লেন। গ্রামের শেষে গোরস্থানের ধারের সেই পাহাড়ের কাছে থেমে দেখ্‌লেন, ঐ যে পাহাড়ের উপর দিয়ে পাখীর ডানার মত আঁচল-খানি উড়িয়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ময়না ছুটে চলেছে।

পাহাড়ের গা দিয়ে উঠে দেখ্‌লেন এক জায়গায় কয়েকটা আলো আর মানুষের ছায়া নড়্‌ছে। একদল লোক ম্লান বিমর্ষ মুখে বসে আছে। শোনা গেল, একজন বল্‌ছে, "লোকটা মদ খেয়ে সব উড়িয়ে, ধারে মাথার চুলটি অবধি বিকিয়ে দিয়েছে। কটা পয়সা পাবার জন্যে জুয়া খেলে পয়সা ত একটাও মিল্‌ল না, উপ্‌রি হেরে গিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হল। শেষকালে কিনা এই পরিণাম!" মাষ্টার হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবামাত্র ময়না তাদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে একটা গর্ত্তের কাছে টেনে নিয়ে চল্‌ল। ময়নার মুখখানা একেবারে শাদা! তাতে রক্তের লেশমাত্র দেখা যাচ্ছে না। তার পাগ্‌লামি আজ কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যার আগমনের অপেক্ষায় সে ছিল, তার আবির্ভাব হয়েছে। আজ তার দুর্ভাবনা কেটে গিয়েছে, সে আজ মুক্তি পেয়েছে। গর্ত্তের কাছে গিয়ে মেয়েটি একটা ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপের মত কি দেখিয়ে দিলে। মাষ্টার ঝুঁকে পড়ে দেখ্‌লেন, গোবর্দ্ধন সরকার একটা পিস্তল হাতে

করে পড়ে আছে। তার শরীরটা একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা।

৩

শিকলকাটা ময়না আগেকার তুলনায় অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। শোকই তাকে ক্রমশ জগতের অন্য পাঁচ জনের মত করে তোল্‌বার চেষ্টা করছিল। তার বাবার একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন রাখ্‌বার জন্যে মাষ্টার নিজের খরচে গোবর্দ্ধন সরকারের নামে তার চিতাভস্মের উপর একটি সমাধি করে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যা বেলা সেদিক দিয়ে বেড়াতে গেলে মাষ্টার প্রায়ই দেখ্‌তেন সমাধির উপর বনফুলের মালা সাজানো রয়েছে। একটি ছোট মাটির প্রদীপও মাঝে মাঝে জ্বল্‌তে দেখা যেত। ফুলের মালাগুলিতে পাশাপাশি ধুত্‌রা, আকন্দ, চাঁপা, কাঠগোলাপ সবই থাকৃত। মধু আর বিষের এই গলাগলি দেখে নবীনের মনে কি একটা বেদনা জেগে উঠ্‌ত।

সেদিন ভারি গরম। বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মাষ্টার দেখ্‌লেন, বনের ঠিক মাঝ্‌খানটিতে একটা ঝুঁকে-পড়া গাছের ডালের উপর ময়না

বনলক্ষ্মীর কোলের শিশুটির মত বসে আছে। তার কোলে রাজ্যের ঘাস পাতা, কচি কচি শালের পল্লব, বুনো ফুল ফল, আরও কত কি! মুখ নীচু করে ময়না গুন্‌গুন্ করে একটা সাঁওতালী গান গাচ্ছিল। দূর থেকে মাষ্টারকে দেখে সে একটু সরে বসে তার অপূর্ব্ব সিংহাসনে বন্ধুর জন্যে জায়গা করে দিলে। অতিথিসৎকার হল বুনো কেশুর আর ফল দিয়ে। তার আগ্রহ্ আড়ম্বর দেখে কে! তার কোলে নানারকম বিষাক্ত ফুল দেখে মাষ্টারের বড় ভয় হল। তিনি বল্‌লেন, তাঁর ছাত্রী হতে হলে ময়না ওসব ছুঁতে পাবে না। ময়না সেগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে আর কখনও সে ছোঁবে না।

ময়না একটু সভ্য ভব্য হয়ে উঠ্‌লে অনেক সদয়হৃদয়া গৃহিণীই তাকে ঘরে ঠাঁই দিতে রাজি হলেন। তাদের মধ্যে দাসগৃহিণীর সকলের চেয়ে বেশী সুনাম। ভদ্রমহিলা খৃষ্টান। কাজেই ময়নার মত কুড়োনো মেয়ের সেই বাড়ীতেই একটু স্বচ্ছন্দে থাকা সম্ভব। আদবকায়দা ও রীতিনীতির বিষয়ে দাসগিন্নি ছিলেন কিন্তু খুব কড়া। নানা রকম রীতিনীতির দড়াদড়ি দিয়ে নিজেকে আষ্টে পৃষ্ঠে

বেঁধে কতশত সাধ্যসাধনার পর তিনি যখন প্রকৃতি দেবীর সকল ছাপই নিজের মন থেকে অনেকটা উঠিয়ে ফেল্‌তে পেরেছিলেন তখনই তিনি খুসী হয়ে বলেছিলেন "এতদিনে স্বর্গের পথে এক পা বাড়ানোর আশা হল।" কিন্তু এত করেও তাঁর ক্ষুদ্র "সংস্করণ"গুলি অনেক পরিমাণেই উচ্ছৃঙ্খল রয়ে গিয়েছিল। মায়ের সঙ্গে এঁটে উঠ্‌তে না পেরে প্রকৃতি ছেলেদের পেয়ে বস্‌লেন। দাসগিন্নির ছেলেবেলার যত অমার্জ্জনীয় অপরাধ তাঁর হৃদয়ে ঢোক্‌বার রাস্তা না পেয়ে, সেই কড়া পাহারার পথ এড়িয়ে কোন্ সুযোগে খিড়্‌কীর দরজা দিয়ে ছেলেমেয়েদের হৃদয়ে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়্‌ল। এত ছেঁটে কেটেও দাসগিন্নি তাঁর ঘরখানিকে সুন্দর ফুলের বাগান করে তুল্‌তে পার্‌লেন না। সৌখীন বাবুদের কেয়ারি-করা ফুলের বাগানের মত সারাক্ষণই এক রকম রূপ ধরে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার মত ছেলেমেয়ে তাঁর নয়। বুনোফুলের মত নানাভাবে অজস্ররূপে ফুটে ওঠাই ছিল তাদের স্বভাব। খোকা, নরু, ফুলু, রাজু, কেউ মায়ের মনের মতন হয়নি। এক কেবল নগেন্দ্র-

নন্দিনী ওরফে নগুই তাঁর আদর্শ-মত গড়ে উঠেছিল। সেই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা। নগুর বয়স তের চোদ্দ হবে। সে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শান্ত শিষ্ট। হাসি ঠাট্টা জানে না, কখনও মায়ের কথার অবাধ্য হয় না।

এই বাড়ীতে মাষ্টার ময়নার স্থান করে দিলেন। দাসগিন্নির একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, নগুই ময়নার আদর্শ। ময়না দুষ্টুমি করলে গৃহিণী তার কাছে নগুর গুণাবলীর অনেক ব্যাখ্যা সুরু করে দিতেন। ময়না অনুতপ্ত হলেও গৃহিণী নগুরই আদর্শ তার চোখের সামনে খাড়া করে তুলতেন। একদিন শোনা গেল ময়না ও গ্রামের আর-সব ছেলে-মেয়েদের আদর্শরূপে পাঠশালায় শোভা পাবার জন্যে নগু নেহাৎ অনুগ্রহ করে তরুণ মাষ্টারের ছোট্ট বিদ্যালয়টিতে আসছে। তিনি একান্ত বাধিত হয়ে নগুকে ভর্ত্তি করে নিলেন। কিন্তু নূতন ছাত্রীটির কল্যাণে তাঁর কাজ অনেক বেড়ে গেল। যখন-তখনই তার কলম ভেঙে যায়, মাষ্টার না কেটে দিলে হয় না। খাতা ছিঁড়েও অহরহই যাচ্ছে, সেটাও মাষ্টারকেই সেলাই করে

দিতে হয়। হাতের লেখা কি অঙ্কের খাতা দেখে দেবার সময় নগু প্রায় মাষ্টারের পিঠের উপর পড়ে অন্য সকলকে আড়াল করে রাখে। তার একরাশ কালো কোঁক্‌ড়া চুল রেশমের পর্দ্দার মতন মাষ্টারের মুখের সাম্‌নে এলিয়ে পড়ে' মাষ্টারকে তার এক্‌লার সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে। পাঠশালায় কোনো জিনিস ফেলে গেলে মাষ্টার না খুঁজে দিলে নগু কিছুতেই সেটা খুঁজে পায় না। তরুণ মাষ্টারও মাঝে মাঝে ছাত্রীকে খুসী কর্‌বার জন্যে তার কাজে একটু বেশী নজর দিতেন। একদিন সন্ধ্যায় মাষ্টার নগুর কি একটা জিনিসের খোঁজ করতে তার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। সেদিন নগুর সঙ্গে তাঁর অনেক গল্পগাছাও হয়েছিল। লোকে দেখে মনে করেছিল মাষ্টার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বুঝি নগুকেই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন।

তার পরদিন সকাল বেলা ময়না পাঠশালে এল না। বেলা বেড়ে চল্‌ল, দুপুর হল, কিন্তু ময়নার দেখা নেই। নগুকে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল, তারা দুজনে একসঙ্গেই ভাত খেয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু ময়না একগুঁয়েমি করে অন্য পথে চলে গেল।

সন্ধ্যা হল, তবু ময়না এল না। মাষ্টার দাসগিন্নির কাছে খোঁজ করতে গেলেন। বেচারী ত' শুনে ভয়ে অস্থির। দাস-মহাশয় ব্রহ্মাণ্ড খুঁজেও ময়নার কোনো খোঁজ পান নি। নরু-রাজুরাও কিছু জানে না। দাসগিন্নি বল্‌লেন, "তবে বুঝি মেয়েটা জলে ডুবে গেছে! ওমা গো কি হবে! পাঁকে কাদায় যে সারা অঙ্গ ভরে যাবে, গোর দেবার সময় কি করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব?" মাষ্টার বিষণ্ণ মনে পাঠশালায় ফিরে এলেন। আলো জেলে মাদুরের উপর চুপ্‌টি করে বস্‌তে গিয়ে দেখ্‌লেন একটুক্‌রো ছেঁড়া কাগজে ময়নার হাতের আঁকা-বাঁকা অক্ষরে তাঁরই নাম লেখা রয়েছে। কাগজ-খানা অঙ্কের খাতার একটা ছেঁড়া পাতা, খুব সযত্নে মোড়া ও ভাত দিয়ে ভালো করে আট্‌কান; পাছে কোনো লোকে তার ভিতরের লুকোনো কথাগুলি জেনে ফেলে সেই ভয়ে উল্টা পিঠে বড় বড় করে লেখা "মালীক ভিন্ন অন্ন কেহ খুলীবে না।" আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে চিঠিখানা খুলে মাষ্টার পড়তে আরম্ভ করলেন ঃ—

সত কোটি প্রণাম পুঃরসঃর নিবেদন, পরে,

মাষ্টার মহাশয় তুমি চিঠিটা পড়বার অনেক আগেই আমি এদেষ থেকে পালিয়ে যাব। আর কোনো দিনও ফিরে আস্‌ব না। কোনো দিনও না, আর একবারটিও না। আমার ফকিরমালাগুলো জানকিয়াকে দিতে চাও ত দিয়ে দিও, আমার মাত্রিস্নেহর ছবিখানা শৈলিকে দিও। কিন্তু নগিকে কিচ্ছু দিও না। খবদ্দার কিছু দিও না বলে রাখ্‌ছি। আমার তাকে কেমন লাগে জানো? দেখলে দু চখ্‌খু জোলে যায়। আজ আর কিছু লিখ্‌ব না। ইতি

শেবিকা শ্রীমতি ময়নাসুন্দরী দাসী!

চিঠিখানা হাতে করে বসে মাষ্টার কত কি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে এল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ কালো পাহাড়ের পিছন থেকে তার চক্‌চকে মুখখানি বার করে পাঠশালার সরু পথটি আলো করে দিলে। দিনের বেলা এই পথের উপর দিয়ে কত চাঁদের মত খোকা খুকী তাদের ফুলের মত পা ফেলে পাঠশালায় এসেছিল, মাষ্টারের বোধ হয় তাও মনে পড়্‌ছিল। আর কিছুক্ষণ ভেবে তিনি যেন একটা কিনারা পেলেন। চিঠিখানাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে পথে উড়িয়ে দিলেন।

পরদিন ভোরবেলা কাক কোকিল ডাক্‌বার আগেই মাষ্টার শালবনের ভিতর দিয়ে শুক্‌নো পাতা মাড়িয়ে চলেছেন; খস্‌ খস্‌ শব্দে দুটো-একটা শেয়াল দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল; কাকগুলো দিনের আলোর দেখা পেয়ে কোলাহল কর্‌তে কর্‌তে বাসা ছেড়ে উঁড়ে বেরুলো। অনেক দিন আগে যে ঘন বনের মধ্যে গাছের ডালে পাখীর মতন ময়নাকে বসে গাইতে দেখেছিলেন, ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে মাষ্টার সেইখানে এসে হাজির। সেই নুয়ে-পড়া গাছের ডালটি আজও তেম্‌নই রয়েছে, তার উপরে কচি পাতার ছাতাটিও মেলা আছে, কিন্তু সিংহাসন আজ খালি। যুবক আর একটু এগিয়ে আস্‌তেই ভীরু বন্য পশুর মত কে যেন গাছপালার মধ্যে চম্‌কে ছুটে পালাল। ঝুঁকেপড়া গাছের ডালপালা ছিঁড়্‌তে ছিঁড়্‌তে শুক্‌নো পাতার উপর দিয়ে হড়মড় শব্দ করে সে কোন্‌' এক ঝোপের কোলে লুকোল। মাষ্টার কাছে গিয়ে গাছের ডালপালার ঘন বুনুনির ভিতর উঁকি মার্‌তেই পলাতক ময়নার কালো চোখের উপর নজর পড়্‌ল। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল, কারুর মুখেই কথা নেই।

শেষকালে ময়নাই তাদের নীরব আলাপের শেষ করলে। কোনো ভূমিকা না করেই সে বলে উঠল, "তোমার কি চাই ?"

অভিনয়ের পালাটা মাষ্টার আগেই মুখস্থ করে এসেছিলেন, অত্যন্ত নরম সুরে বললেন, "গোটা কয়েক কুল আর কেশুর।"

"সে-সব পাবে-টাবে না। চলে যাও এখান থেকে। নগেন্দ্রনন্দিনীর কাছে যাওনা গিয়ে দুষ্টু কোথাকার।" রাগের চোটে নগেন্দ্রনন্দিনীর নামে জোর দিতে গিয়ে ময়না অনেকগুলো রফলা জুড়ে দিয়েছিল।

"মইনু, আমার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, কাল থেকে কিছু খাইনি। ক্ষিদেয় মরে যাচ্ছি।" এই বলে তরুণ মাষ্টার ক্লান্ত শরীরে গাছের উপর হেলে পড়লেন।

এইবার ময়নার মনটা একটু নরম হল। অনেক দিন আগে সে যখন ভবঘুরের মত পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াত, সেই দুঃখের দিনের কথা মনে করে মাষ্টারের কল্পিত এই বেদনাটা সে বুঝলে। তাই অমন বুক-ভাঙা করুণ সুরে ময়না একটু বিচলিত

হল। তার সন্দেহটা কিন্তু তখনও একেবারে ঘোচেনি। সে বল্‌লে, "ঐ গাছের গোড়াটায় খুঁড়ে দেখ, অনেক পাবে এখন; কিন্তু কাউকে বোলো না যেন।" ময়নার ভাঁড়ারে চোরের অভাব ছিল না।

মাষ্টার মশায় যে কিছু খুঁজে পেলেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। ক্ষুধায় বোধ হয় তাঁর সমস্ত শক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। ময়নার বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। শেষকালে আর স্থির থাক্‌তে না পেরে পাতার ঝোপের ভিতর থেকে পাখীর মত ঘাড় বেঁকিয়ে একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "আচ্ছা, আমি যদি নীচে নেমে তোমায় গোটা কয়েক ফল পাকুড় বের করে দি, তাহলে আমায় ছোঁবে না তুমি?" মাষ্টার তৎক্ষণাৎ রাজি। ময়না বল্‌লে, "যে আমায় ছোঁবে, সে যমের বাড়ী যাবে।"

চুক্তিভঙ্গের ফলে মাষ্টার ইহজগৎ ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজি হলেন না। তখন ময়না ঝপ্ করে গাছের উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়্‌ল। এইবার কিছুক্ষণ নীরব ভক্ষণের পালা। একটু পরেই ময়না

পাকা গিন্নির মত বিজ্ঞভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি ?" মাষ্টার তখনই আরোগ্য লাভের লক্ষণ দেখাতে সুরু কর্‌লেন। তারপর ময়নাকে ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ীমুখো হলেন। দুচার পা যেতে না-যেতেই ময়না তাঁকে এক ডাক দিলে। ময়না যে তাঁকে ডাক্‌বে তা তিনি আগেই জান্‌তেন ; কাজেই ডাক্‌বা মাত্রই ফির্‌লেন। ময়নার মুখখানা একেবারে শাদা হয়ে গিয়েছে, তার বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দুটি জলে টলটল কর্‌ছে। মাষ্টার তার কাছে গিয়ে ছোট দুখানি হাত ধরে তার সজল চোখের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "মইনু, সেই যেদিন তুমি প্রথম আমাকে দেখ্‌তে এসেছিলে, সেই সন্ধ্যেবেলার কথা মনে পড়ে কি ?" হ্যাঁ, ময়নার সে কথা খুবই মনে আছে। "তুমি পাঠ্‌শালে পড়্‌তে পার কি না আমায় জিজ্ঞেস কর্‌লে, তুমি বলেছিলে লেখাপড়া শিখ্‌বে, ভাল মেয়ে হবে, তাই আমি বল্‌লাম . . . ."

ময়না তাড়াতাড়ি বল্‌লে, "থাক, থাক।"

যুবক বল্‌লেন, "আজ যদি তোমার মাষ্টার এসে বলে যে তার সেই ছোট্ট ছাত্রীটিকে নইলে একলাটি

তার দিন কাটে না, সেই ক্ষুদে মেয়েটি এসে তাকে ভাল হতে না শেখালে কিছুতেই চল্‌বে না, তাহলে তুমি তাকে কি বল ?”

মেয়েটি কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট করে রইল। মাষ্টারও তার উত্তরের অপেক্ষায় চুপ করে রইলেন। একটা খরগোশ ছুটে এসে তার নরম-নরম তুটি পা তুলে ঝক্‌ঝকে চোখ তুটি মেলে ঐ তুটি নীরব মানুষের দিকে চেয়ে রইল। একটা কাঠবিড়ালী সেই পোড়ো গাছটা বেয়ে খানিকটা ছুটে এসে সেইখানেই থেমে তার ল্যাজটি উল্টে পিঠে বুলোতে লাগ্‌ল। মাষ্টার চুপিচুপি বল্‌লেন, “মইনু, সবাই যে তোমার জন্যে বসে।” মইনু একটু মিষ্টি হাসি হাস্‌লে। দখিন হাওয়া সেই সময় গাছের মাথায় মাথায় একটা কাঁপন দিয়ে গেল, ঘন ডালের ফাঁক দিয়ে একটি আলোর রেখা এসে সেই অস্থিরচিত্ত ছোট মানুষটির ঠিক মুখের উপর পড়্‌ল। হঠাৎ ঝট্‌ করে উঠে ময়না মাষ্টারের হাতখানা ধর্‌লে। কি একটা কথাও বল্‌লে, কিন্তু বোঝা গেল না। তার কালো চুলগুলি কপালের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে মাষ্টার একটি চুম্বন কর্‌লেন। তারপর বনের

ম্লান আলো ও ভিজে মাটির গন্ধ পিছনে রেখে দুজনে খোলা পথের আলোয় বেরিয়ে এলেন।

৩

অন্য ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আগের তুলনায় অনেকটা ভাল ব্যবহার করলেও নগেন্দ্রনন্দিনীর উপর ময়নার বেজায় রাগ। তার সেই হিংসাটুকু বোধ হয় তখনও নিবে যায়নি। নগুর গোলগাল শরীরে চিম্‌টি কাটা বোধ হয় তার বেশ সুখকর বোধ হত। মাষ্টারের চোখের উপর এ রকম শত্রুতার ততটা সুবিধা না হওয়ায় ময়না এক নূতন পথ আবিষ্কার করলে।

ময়নাকে প্রথম দেখে তার পুতুল-টুতুল থাকা সম্ভব বলে মাষ্টারের মনে হয়নি। তবে অনেক বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ্‌ও প্রথমে যা মনে করেন না, পরে তা দেখ্‌তে পান। কাজেই ময়নারও একটা পুতুল আছে দেখা গেল। তার চেহারাটা ঠিক ময়নারই পুতুল হবার উপযুক্ত। তারই যেন একটি ছোট প্রতিমূর্ত্তি। দাসগিন্নি একদিন হঠাৎ এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করে-ফেল্‌লেন। আগেকার দিনে পুতুলটা ছিল ময়নার ভ্রমণের সাথী। তার প্রতি অঙ্গে পুরা-

কালের কষ্ট-সহ্যের অনেক নিদর্শন আঁকা আছে। রোদে জলে তার গায়ের আসল রং অনেককাল উঠে গেছে, তার জায়গায় এখন খানা-ডোবার কাদা লেপা। ময়নাকে আগে যেমন দেখাত, এর চেহারাও অনেকটা সেই রকম। তারই ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের নেকড়া এর কাপড়। ছোট মেয়েদের মতন ময়না কোনোদিন একে আদর করত না। পাঠশালার উঠানে একটা গাছের কোটরের ভিতর বেচারা সারাদিন একলাটি শুয়ে থাকত। ময়না একলা বেড়াতে যাবার সময় তাকে সঙ্গে নিত। ময়নার মতন তারও কোনো বাবুআনা কি সখের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না।

দাসগৃহিণীর মনে করুণার সঞ্চার হওয়ায় তিনি ময়নাকে একটা নূতন পুতুল কিনে দিলেন। ময়না খুব গম্ভীর ভাবেই সেটা নিলে, কিন্তু মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। পুতুলটার লাল লাল গাল আর নীল নীল চোখ ঠাউরে দেখ্তে দেখ্তে ময়নার একদিন মনে হল, এর সঙ্গে নগুর কিছু সাদৃশ্য আছে। পুতুলটার কপালগুণে ময়নার চোখে সেটা ধরা পড়ে যাওয়াতে সে তখুনি পুতুলের মোমের

মাথাটা পাথরের উপর আছ্‌ড়ে ভাঙ্‌লে; তারপর তার গলায় একটা দড়ি বেঁধে যখন-তখন রাস্তা দিয়ে হিঁচ্‌ড়ে বাড়ী থেকে পাঠশালা আর পাঠশালা থেকে বাড়ীতে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। কখনও বা বেচারা নির্দ্দোষীর নিরীহ শরীরে ছুঁচ ফুটিয়ে বসিয়ে রাখ্‌ত। কুশপুত্তলি পুড়িয়ে লোকে যেমন শত্রুর অমঙ্গল কামনা করে, ময়না এর ওপর দিয়ে সেই রকম কোনো অভিচার করতে চাইত, কি নগুর শ্রেষ্ঠতার আর-একটা নিদর্শন দেখে রাগে ও-রকম করত তা ঠিক বলা যায় না।

ময়নার এই রকম অনেক খেয়াল ছিল বটে কিন্তু গুণও দুটো চারটে ছিল। ছোট ছেলে-মেয়েদের মত সে কোনো কাজে হাত দিতে ইতস্ততঃ করত না। তার সাহস বড়ই বেশী। সব কাজই সে ঝাঁ করে স্থরু করে দিত। কোনো প্রশ্ন করলে উত্তর দিত বেশ একটু গর্ব্বের সঙ্গে। তবে উত্তরগুলি যে সব সময়েই অভ্রান্ত হত তা বলা চলে না। তবে তার সাহস ও স্পর্দ্ধা দেখ্‌লে মাষ্টারের মনেও মাঝে মাঝে নিজের বিদ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হত।

ময়না যখন মাষ্টারের একলার জিনিস হয়ে পড়্‌ল, তখন আর তার খেয়াল নিয়ে আমোদ করে কাটানো চল্‌ল না। তাকে ভাল ত মাষ্টার খুবই বাস্‌তেন; কিন্তু তাকে মানুষ করে তুল্‌তে হবে ত। এই বিষয়ে অনেক ভেবে চিন্তে মাষ্টার ঠিক কর্‌লেন ময়নাকে বিচার করা তাঁর পক্ষে ঠিক সম্ভব নয়। গ্রামের পাদ্রীর পরামর্শ-মত কাজ কর্‌লে বোধ হয় নিরপেক্ষ বিচার হওয়া সম্ভব। পাদ্রীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল না; কিন্তু ময়নার মঙ্গলের কথা, বিশেষতঃ তাঁদের পরিচয়ের সন্ধ্যার কথা, মনে করে তাঁর এই অপ্রিয় কাজটাও বেশ একটা গৌরবের কাজ বলে মনে হল। সেদিন সন্ধ্যায় ঐ বনের পাখীটি যখন আর কারও কাছে ধরা না দিয়ে স্বেচ্ছায় তাঁরই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল তখন তার ভার ভগবান্ নিশ্চয়ই ওই ক্ষুদ্র মানুষটির উপরই দিয়েছিলেন।

পাদ্রী তাঁকে দেখে খুবই খুসী হয়ে উঠ্‌লেন। নিজের বাতের ব্যথা প্রভৃতির বিস্তৃত কাহিনী শুনিয়ে তিনি দাসগৃহিণীর বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। তাঁদের কথা তুলেই পাদ্রী-মশায় ঐ আদর্শগৃহিণী

আর তাঁর কন্যার শতমুখে প্রশংসা আরম্ভ করলেন। নগুর প্রশংসা ত তাঁর মুখে ধরে না। মেয়ে বল্‌তে হয় ত ঐ মেয়ে। যেমন তার রূপ তেমনই তার গুণ। মাষ্টার দেখ্‌লেন এর পর ময়নার কথা তোলা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। পাদ্রীর মতে বোধ হয় ময়নার নরক ভিন্ন গতি হবে না। অগত্যা মাষ্টার ময়নাকে একান্ত তাঁরই আশ্রিত ভেবে একটা সামান্য ছুতো করে বেরিয়ে পড়্‌লেন। এই সামান্য ঘটনাটি আবার ছাত্রী ও মাষ্টারকে আগেকার মত পরস্পরের খুবই কাছে এনে ফেল্‌লে। মাষ্টারের এই ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে ছাত্রী খুবই খুসী হয়ে উঠেছিল। হারানো জিনিস খুঁজে পেলে লোকে তাকে যেমন চোখে-চোখে রাখে, ময়নাও তার গুরুটিকে তেমনি করে ঘিরে রাখ্‌লে। আবার এখন খাওয়াদাওয়ার পর আগেকার মতন দুজনে মাঠে মাঠে বনে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তাদের এই পথ চলার কোনো লক্ষ্য ছিল না। দুটিতে পথ চলাতেই তাদের আনন্দ।

একদিন চল্‌তে চল্‌তে ময়না হঠাৎ থেমে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির উপর চড়ে বস্‌ল। সেখানে

বসে মাষ্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন তাঁর মনের ভিতর ডুবুরী নামিয়ে খোঁজ আরম্ভ করলে। মাথা নেড়ে কালো চুলগুলি নাচিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে "আচ্ছা, তুমি পাগল, নয়?" "না।" "তোমার ক্ষিদে পায়নি?" (ময়নার মতে ক্ষুধা রোগটি মানুষকে যখন-তখন পেয়ে বস্‌তে পারে।) "না।" "তার কথা ভাব্‌ছ না?" মাষ্টার খুব মিষ্টি সুরে বল্‌লেন, "কার কথা মইনু?" "সেই কটা মেয়েটার কথা।" (ময়না নিজে কালো বলে নগুকে এই নাম দিয়েছিল।) "না।" "সত্যি বল্‌ছ?" "হ্যাঁ।" "দিব্যি করে বল।" "আচ্ছা, তোমার দিব্যি বল্‌ছি।" ময়না ছুটে এসে মাষ্টারকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেয়ে আবার পাখীর ডানার মত আঁচল উড়িয়ে চলে গেল। এর পর তিন চার দিন ময়না অন্য ছেলে-মেয়েদের মত ভালো হয়ে চল্‌তে স্বীকার করেছিল।

৪

এই গ্রামে মাষ্টারী আরম্ভ কর্‌বার পর মাষ্টারের দু বৎসর কেটে গিয়েছে, কিন্তু তাঁর আয়বৃদ্ধির কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। কাজেই তিনি অন্য

জায়গায় যাবার জোগাড় কর্‌তে লাগ্‌লেন। এ কথা তিনি তাঁর বন্ধু গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার ছাড়া আর কোনো লোককে বলেন নি। আগামী বৎসর বসন্ত-কালে তাঁর যাবার কথা; কিন্তু লোকে বড় গোলমাল করে বলে তিনি কথাটা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন; ময়না পাছে শুনে ফেলে সে ভয়টাও ছিল।

ময়নার কথা তিনি সহজে ভাব্‌তে চাইতেন না। তার কথা মনে পড়্‌লে তিনি 'স্বার্থপরের' মত নিজেই নিজেকে অনেক মন-গড়া উত্তর দিতেন। ভাব্‌তেন, ময়নার প্রতি টান, ও কিছু না; ওটা কল্পনা, জল্পনা, পাগ্‌লামি, বোকামি; আমার চেয়ে বড় আর দৃঢ়চিত্ত লোকের হাতে পড়্‌লেই বোধ হয় ময়নার ভালো হবে। ময়নার এখন দশ এগারো বছর বয়স, আর তিন চার বছর পরে ত সে বেশ বড়সড়ই হয়ে উঠ্‌বে। তখন ত আমাকে ভুলেই যাবে; আমি কেন মিথ্যে মায়া বাড়িয়ে নিজের পথ বন্ধ করি!

কর্ত্তব্যের যাতে ত্রুটি না হয় এই মনে করে তিনি ময়নার আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল সকলকে এক-একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর

এক মাসি বেহারে স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছেন, তিনিই কেবল তাঁকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চিঠির উত্তর দিয়েছেন। চিঠিতে ময়নার ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের কোনো উল্লেখ না থাক্‌লেও মাষ্টার মাসির বাড়ী ময়নার কত আদর যত্ন হবে, স্নেহশীলা রমণীর কাছে থাক্‌লে সে কত শান্তশিষ্ট হবে, এইসব অনেক আকাশকুসুম গড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু চিঠিখানা ময়নাকে পড়ে শোনাতে গিয়ে তাঁর চমক্ ভাঙ্‌ল। চিঠির দিকে সে ফিরেও তাকালে না। চুপ করে বসে বসে শুন্‌লে, পড়া হয়ে গেলে কাগজখানা কেটে কয়েকখানা মানুষের আকৃতি করে তার গায়ে "কটা মেয়েটা" লিখে পাঠ্‌শালার ঘরের দেয়ালময় লাগিয়ে বেড়াল।

শীত্‌কাল কেটে গিয়ে বসন্ত দেখা দিল। গাছে গাছে নূতন পাতা, ছোট ছোট কুঁড়ি ও শালবনের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বসন্তের দূতরূপে, আগেই এসে উপস্থিত। পাহাড়ের গায়ে এক-একটা কাঠ-গোলাপের গাছ ফুলের ভারে হাস্যমুখী বালিকার মত মাথা হেঁট করে আছে। বড় বড় মাঠের দিকে তাকালে আর কোথাও ধূসর রং দেখা যায়

না ; কে যেন সমস্ত বনে উপবনে মাঠে ঘাটে সবুজ তুলি বুলিয়ে গিয়েছে, এক তিলও ফাঁক নেই। মাঝে মাঝে ছু চারটি ঘাসের ফুল মিট্‌মিট করে চেয়ে আছে। গোরস্থানের গায়ে কালপুরুষ আরো ছু চারটি স্তূপ বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিছু দূরে গোবর্দ্ধন-সরকারের সমাধি পড়ে আছে, তারও গায়ে সবুজ শেওলা অনেকখানি রং ধরিয়ে দিয়েছে।

শহরে এক সার্কাসের দল এসেছিল ; তারা ফিরে যাবার পথে আশেপাশের গ্রামগুলিতে ছু এক দিনের জন্যে আড্ডা গেড়ে গেড়ে যাচ্ছে। ময়নাদের গ্রামও বাদ যায়নি। গ্রামের নবীন দলের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছে। মাষ্টারের পাঠশালার শিশু-গুলি সার্কাস ছাড়া আর কোনো কথাই বলে না। তাদের কাছে জিনিসটা একেবারেই নূতন। মাষ্টার ময়নাকে একদিন সার্কাস দেখাবেন বলেছেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ময়না ও মাষ্টার সার্কাসে গিয়ে-ছেন। ঘোড়দৌড়, তারের উপর নাচ, সঙের খেলা, সবই হল। মাষ্টার ময়নার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন কোনোটাতেই তার গম্ভীর মুখে হাসির উদ্রেক

কর্‌তে পার্‌লে না। খেলা শেষ হয়ে গেলে ময়না একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে চোখ দুটি কুঁচ্‌কে ভুরু দুটি নামিয়ে আন্‌লে। তারপর মাষ্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কাষ্ঠহাসি হেসে বল্‌লে "আমায় বাড়ী নিয়ে চল।" কথাটা বলেই ময়না মুখ নীচু করে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌ল। মাষ্টার সারা পথ তাকে হাসাবার চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু সবই বৃথা। সে দুহাতে তাঁর হাতখানা ধরে তাঁর চোখের দিকে তাকাতে চেষ্টা কর্‌ছিল, কিন্তু মাস্টার যেন একটু ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছিলেন না। কোনো রকমে ময়নাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েই মাষ্টার আপন পথে প্রস্থান কর্‌লেন।

এর পর দু তিন দিন ময়না দেরী করে পাঠ-শালায় আস্‌তে লাগ্‌ল। তাঁর পথের সম্বল সঙ্গীটির অভাবে সেবারকার শুক্রবারে মাষ্টারের সান্ধ্য ভ্রমণই হল না। বই খাতা গুছিয়ে বাড়ী যাবার জোগাড় কর্‌তে কর্‌তে শুন্‌লেন মিহি গলায় কে বল্‌ছে, "দেখুন, মাষ্টার মশায়।" মাষ্টার ফিরে দেখ্‌লেন নরু। ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্ত

হয়ে বল্‌লেন, "কি হে, কি হয়েছে? বলে ফেল শীগ্‌গির করে।"

"দেখুন, আমি আর ভোলা ভাব্‌ছিলাম যে ময়না আবার পালিয়ে যাবে।"

অপ্রিয় কথা লোকে যার কাছে শোনে তার উপরই একটু অযথা-ভাবে চটে ওঠে। মাষ্টারও বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, "কি সব যা তা বক্‌ছ?"

"হ্যাঁ দেখুন, সত্যি বল্‌ছি, ও আজকাল বাড়ী থাকে না; আমি আর ভোলা ওকে সার্কাসওয়ালা-দের সঙ্গে কথা বল্‌তে শুনেছি। আজও ওকে তাদের কাছে দেখে এলাম। কাল ও আমাদের বল্‌লে যে ও সেই মেয়েটার মতন বল নিয়ে তারের উপর নাঁচ্‌তে পারে; আরো কত সব খেলা আমাদের দেখালে।" তাড়াতাড়ি কথা বল্‌তে বল্‌তে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নরুর প্রায় গলা বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল, সে থেমে গেল।

মাষ্টার বল্‌লেন, "সার্কাসের কোন্ লোকটার সঙ্গে দেখ্‌লে?"

"ওই যে সেই ঝক্‌ঝকে টুপি-পরা লোকটা। সেই বাবরী চুল। আর সোনার বোতাম পরা

আর সোনার চেনও আছে।” ঢোক গিল্‌তে গিল্‌তে অনেক কষ্টে নরু এই কটা কথা বল্‌লে।

মাষ্টারের মনে হল বুকের ভিতর কি একটা যেন শক্ত হয়ে উঠ্‌ছে, বই খাতা ফেলেই তিনি দৌড় দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়্‌লেন। নরু ছোট ছোট পা ফেলে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ে চল্‌তে খুব চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। পথের মাঝখানে হঠাৎ থেমে মাষ্টার প্রায় নরুর ঘাড়ে পড়্‌বার জোগাড়। আবার কথা সুরু করে মাষ্টার বল্‌লেন, “তারা কোথায় কথা বল্‌ছিল?”

“সেই আটচালার কাছে।”

বড় রাস্তার উপর এসে মাষ্টার দাঁড়ালেন, নরুকে বল্‌লেন, “যা, ছুটে গিয়ে দেখে আয় ময়না বাড়ী আছে কি না, থাক্‌লে আটচালায় এসে আমাকে বলিস্। না থাক্‌লে আর আস্‌তে হবে না। যা দৌড়ে যা।”

নরুর ছোট পায়ে যত শক্তি ছিল তত জোরে সে দৌড় দিল।

আটচালার কাছে আস্‌তে কতকগুলো লোক হাঁ করে মাষ্টারের দিকে চেয়ে রইল। মাষ্টার

পকেট থেকে রুমালখানা বের করে মুখটা মুছে ঘরে ঢুকলেন। ঘর বারাণ্ডা চারি ধারে খুঁজেও ময়নার দর্শন পাওয়া গেল না। এক দিকের বারাণ্ডায় একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তার মাথায় জরির টুপি। তার সাজসজ্জা চুলকাটা দাড়িছাঁটা দেখেই মাষ্টারের ভক্তি চটে গিয়েছিল। লোকটা তাঁকে দেখ্‌তে পেয়েও চুরুট হাতে করে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল যেন কিছুই জানে না। মাষ্টার তার ঠিক সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালেন। দুজনে চোখোচোখি হতেই মাষ্টার আর-একটু কাছে সরে এলেন। কিন্তু কথা বল্‌তে সুরু কর্‌তেই গলার ভিতর কি যেন একটা ঠেলে উঠে তাঁর স্বর বন্ধ করে দিচ্ছিল। তাঁর নিজের গলার স্বর শুনে তিনি নিজেই ভয় পেয়ে গেলেন। কেমন যেন ক্ষীণ, ভাঙা, বহু দূরের একটা স্বর। মাষ্টার বল্‌লেন, "শুন্‌লাম্ ময়না বলে আমার পাঠশালার একটি মেয়ে তোমাদের দলে ভর্ত্তি হবার জন্যে তোমার কাছে কি সব বলেছে। সত্যি না কি?"

লোকটা চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে এদিক ওদিক পাইচারি কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে, "যদি বলেই থাকে?"

মাষ্টারের গলার স্বর আবার বন্ধ হয়ে এল। অতি কষ্টে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার কথা সুরু করলেন, "তুমি যদি মানুষ হও তা হলে আমি তার অভিভাবক এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে। তার ভবিষ্যতের জন্য আমিই দায়ী। তুমি যে তাকে কি রকম জীবনের পথে নিয়ে যাচ্ছ তা তুমিও জান, আমিও জানি। মানুষের মত কথা বলতে চাও ত বল। ওর মা নেই, বাপ নেই, ভাই বোন ত্রিসংসারে কেউ নেই। তুমি কি তাদের অভাব পূরণ করবে?"

লোকটা চারিদিকে চেয়ে একটু মুচ্‌কি হাসি হাস্‌লে।

মাষ্টার বল্‌লেন, "তোমার কাছে অনুরোধ করছি ওকে আর কিছু বোলো না, আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি ওকে......" বল্‌তে বল্‌তে আবার যুবকের গলার স্বর কেঁপে বন্ধ হয়ে এল।

লোকটা কি বুঝল জানি না, একটা চাষাড়ে রকম ঠাট্টা করে বল্‌লে, "আমার সঙ্গে চালাকি খাটবে না।"

তার কথার চাইতে কথার সুরে, চাহনির ভঙ্গীতে আর ধরণধারণেই মাষ্টারের বেশী অপমান বোধ হল। লোকটা হেসে দাঁতকটা ঢাক্‌বার আগেই মাষ্টার এতক্ষণের রাগের জ্বালা মিটিয়ে তার মুখের উপর এক ঘুসি মার্‌লেন। জানোয়ার-টার মাথার টুপি দশহাত দূরে ছিট্‌কে পড়্‌ল, চুরুটটা হাত থেকে ছট্‌কে পাশের একজন লোকের গায়ের চাদরে গিয়ে পড়্‌ল। অত জোরে ঘুসি মার্‌তে গিয়ে মাষ্টারের হাতখানা ত ফেটে চটে রক্তারক্তি। সার্কাসওয়ালার সখের ছাঁটা দাড়িও কিছুদিনের জন্য একটু নূতন রূপ ধারণ কর্‌লে।

কিছুক্ষণ ধরে খুব মারামারি, ঝুটোপুটি, গালা-গালি চল্‌ল। চারধাবে অনেক লোকজন দৌড়া-দৌড়ি করে এসে হাজির। হঠাৎ একদল লোক এসে জরির টুপীধারীকে ঘিরে দাঁড়াল। মাষ্টারের যখন হুঁস হল তখন সেখানে আর প্রায় কেউ নেই। একজন লোক তাঁর বাঁ হাতখানা ধরে দাঁড়িয়ে, ডান হাত দিয়ে তখনও দরদর করে রক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু সেই হাতের মুঠির ভিতর একটা

ঝক্‌ঝকে ছুরি। কখন যে কে সেখানা তার হাতে দিয়ে গিয়েছে তার ঠিক নেই।

দাসমশায় মাষ্টারের হাত ধরে তাঁকে হিড়হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাষ্টার আবার ফির্‌বার চেষ্টা করে ক্ষীণস্বরে বল্‌লেন, "ময়না ?" দাসমশায় বল্‌লেন, "সে বাড়ীতে।" পথে যেতে যেতে তিনি বল্‌লেন যে ময়নাই তাঁকে বাড়ী গিয়ে ডেকে এনেছে; সে গিয়ে বল্‌লে যে একটা লোক মাষ্টারকে খুন কর্‌ছে। দাসমশায়ের সঙ্গে কিছু দূর গিয়ে মাষ্টার পাঠশালার পথে চল্‌লেন। কাছাকাছি গিয়ে পাঠশালার দরজা খোলা দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেলেন। ভিতরে ঢুকে দেখ্‌লেন ময়না। একলা ঘরে ময়নাকে বসে থাক্‌তে দেখে ত তিনি অবাক।

মাষ্টার স্বভাবতই একটু স্বার্থপর ছিলেন। সার্কাসওয়ালার সেই চাষাড়ে ঠাট্টাটা এখনও মাষ্টারের মনে কাঁটার মত বিঁধে উঠ্‌ছিল। তিনি ভাব্‌ছিলেন ময়নার প্রতি তাঁর ভালবাসাটাকে এমন চোখে দেখা বোধ হয় লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়, তা ছাড়া ময়না ত স্বেচ্ছায়ই তাঁর স্নেহ ও

ভালবাসা ছেড়ে গিয়েছে। তবে আর তার কথা অত ভেবে কি ফল? এত লোকে যখন ওর আশা ছেড়ে দিলে তখন তাঁরই বা কি দায়? ওকে যে মানুষ করা যাবে না সে ত দেখাই যাচ্ছে। জগতে কি আর কেউ অনাথ নেই? তাদের মতন করেই না হয় ওরও দিন চল্‌বে। যার জন্যে এত কাণ্ড সে ত বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছিল। লাভের মধ্যে তাঁর প্রাণটা নিয়ে টানাটানি। লোকে এখন তাঁকে কি বল্‌বে?

এই আত্মচিন্তার সময় ময়নার সঙ্গে দেখা কর্‌তেই তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। ঘরে ঢুকে তিনি ময়নাকে বল্‌লেন, এখন তাঁর অনেক কাজ, ময়না না থাক্‌লেই ভাল হয়। ময়না উঠে দাঁড়াতে মাষ্টার দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সেখানে বসে পড়্‌লেন। অনেকক্ষণ পর চোখ চেয়ে দেখ্‌লেন, ময়না তখনও সেই ভাবে দাঁড়িয়ে। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাষ্টার মুখ তুল্‌তেই বল্‌লে, "তুমি কি লোকটাকে মেরে ফেলেছ?"

মাষ্টার বল্‌লেন, "না।"

ময়না খুব তাড়াতাড়ি বলে উঠ্‌ল, "কেন একেবারে মেরে ফেল্‌লে না ওকে ? ওই জন্যেই ত তোমার হাতে ছুরিখানা দিয়েছিলাম।"

মাষ্টার যেন আকাশ থেকে পড়্‌লেন, "তুমি ছুরি দিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ, আমিই দিয়েছিলাম। আমি সেই কোণের গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম তুমি লোকটাকে মার্‌লে, তারপর দুজনেই পড়ে গেলে। তার জামার পকেট থেকে ছুরিটা পড়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে সেটা তোমার হাতে তুলে দিলাম। মার্‌লে না কেন এক ঘা ?" ময়না একটানে সব কথাগুলো বলে নিলে। তার কালো চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠ্‌ল, ছোট হাতখানাও শক্ত মুঠি বেঁধে উঠ্‌ল।

মাষ্টার নির্ব্বাক !

ময়না আবার কথা সুরু কর্‌লে, "তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করতে তাহলে আমি বল্‌তুম যে আমি ওই বাজিকরদের সঙ্গে চলে যাচ্ছি। কেন যাচ্ছিলাম জানো ? তুমি যে আমায় না বলে চলে যাচ্ছিলে। আমি সব

জানি। তুমি যখন ডাক্তারকে বল্‌ছিলে তখনই আমি শুনেছিলুম। নগিদের বাড়ী একলাটি থাক্‌তে আমার বয়ে গেছে। মরে গেলেও থাক্‌তাম না।”

খুব হাত মুখ ভঙ্গী করে কথা বলে ময়না নিজের জামার ভিতর হাত গলিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট সবুজ পাতা বের কর্‌লে। পাতাগুলোকে হাত বাড়িয়ে অনেকখানি দূরে ধরে সেই আগেকার মত সাঁওতালী সুরে খুব জোর দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, “তুমি বলেছিলে এই বিষ পাতা খেলে আমি মরে যাব। বেশ হবে, এইগুলো খেয়ে মর্‌ব, নয়ত ওদের সঙ্গে চলে যাব। এখানে আমায় কেউ দেখ্‌তে পারে না, সবাই আমায় ঘেন্না করে, আমি কখ্‌খনো এখানে থাক্‌ব না। তুমিও নিশ্চয় আমাকে দু চক্ষে দেখ্‌তে পার না, নইলে অমন কর্‌তে দিতে না।”

ময়না থরথর করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, তার চোখ দিয়ে বড় বড় দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়্‌ল। চোখের জল পাছে ধরা পড়ে যায় তাই চট্‌ করে সে জলটা মুছে ফেল্‌লে, গালে বোল্‌তা বস্‌লেও

লোকে তত তাড়াতাড়ি করে না। "আমায় যদি কয়েদ করে রেখে, যেতে না দাও তবে আমি বিষ খাব। খাব না কেন? আমার বাবা ত আত্মহত্যা করেছিল। তুমি যেদিন বলেছিলে এগুলো খেলে মানুষ মরে যায় আমি সেই দিন থেকেই এগুলো বুকে করে নিয়ে বেড়াই।"

মাষ্টারের চোখের সাম্‌নে গোবর্দ্ধন সরকারের নির্জ্জন সমাধিটা ও ক্ষুদ্র বালিকার ক্রুদ্ধ মূর্ত্তিটি ভেসে উঠ্‌ল। তার হাত দুখানি ধরে চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বল্‌লেন, "আমার সঙ্গে যাবে মইনু?"

বালিকা ছুটে এসে দুহাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে মহানন্দে লম্বা টান দিয়ে বল্‌লে, "হুঁ......।"

"যদি আজকেই—আজ রাত্রেই যাই।"

"আজ রাত্রেই যাব।"

যে বাঁকা সরু পথের উপর দিয়ে ময়না একদিন ক্লান্ত চরণে মাষ্টারের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই পথে আজ দুজনে হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে পড়্‌ল। সে পথে তার চরণচিহ্ন আর কোনো দিন পড়বে বলে মনে হল না। আকাশের তারাগুলি

তাদের মাথার উপর জ্বলে উঠ্‌ল। আজ মাষ্টার ও ছাত্রীর শিক্ষা সমাপ্ত হল। পাহাড়-ঘেরা গ্রামখানির পাঠশালার দরজা আজ তাদের কাছে চিরদিনের মত রুদ্ধ। *

---

* ব্রেট হার্টের গল্প হইতে।

রূপকথা।

(১)

রাজা পুরুষোত্তমের প্রাসাদে আজ উৎসব লেগে গেছে। আজ কোজাগর পূর্ণিমা। লক্ষ্মীর বরপুত্রের চক্ষে আজ নিদ্রা নেই; তিনি সরস্বতীর শতদল আসন আজ শতহস্তে লুট করে এনেছেন। লক্ষ্মীর স্বর্ণভাণ্ডারের অজস্র সম্পদেও যে এ উৎসবের মাধুরী ফুটে উঠ্‌বে না, তাই শুভ্র পূর্ণিমা-রজনীকে আজ শুভ্র শতদল ও শেফালির মালায় সাজিয়ে তুল্‌তে হবে।

ফুলে ফুলে প্রাসাদ-অঙ্গন ভরে উঠেছে; পূর্ণিমার চাঁদ শেফালিবনের সবুজ পাতায় আলোর হাসি ছড়িয়ে দিয়ে দূরে কাশবনের শুভ্র অঙ্গে জ্যোৎস্নার ধারা ঢেলে দিচ্ছে। শরৎলক্ষ্মী আজ কোমল কাশের মৃদু তালে-তালে শতহস্তে বিশ্ববাসীকে তাঁর উৎসবে ডাক দিচ্ছেন! রাজপুরীর যেখানে যে ছিল সবাই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত। জরা যার মাথায় শরতের মেঘের মত শাদা পাগ্‌ড়ী পরিয়ে দিয়েছে, সেও উৎসবের আনন্দে পাগল; আবার

ধরণী যাকে সবে তার শ্যাম বাহু মেলে কোলে তুলে নিয়েছে, সেও ছোট কচি দুটি হাত মেলে উৎসবের আনন্দে যোগ দিয়েছে। বর্ষার জলধারায় স্নান করে গাছের মাথা যেমন সবল সতেজ হয়ে উঠেছে, যৌবনের স্পর্শে তরুণ-তরুণীরা তেম্‌নি শোভন হয়ে উঠে উৎসবে প্রাণসঞ্চার করেছে।

যার যেমন বয়স সে তেমনি করেই তার উৎসব কর্‌বে। তাই কিশোরী কুমারীরা আজ তাদের সুন্দর হাতের নিপুণস্পর্শে রাজপুরী শ্রীমণ্ডিত করে তুল্‌তে চায়। ফুলের স্তূপ যেখানে শুভ্র তুষার-পর্ব্বতের মত চাঁদের আলোয় গা ঢেলে পড়ে আছে, প্রজাপতির পাখার মত অসংখ্য বিচিত্র রঙের হাল্কা পোষাকে তরুণ তনুগুলি সাজিয়ে তারা সেইখানেই ভিড় করেছে। পলকে পলকে হাতে হাতে কত ফুলের মালা, অলঙ্কার, আসন, পাখা, ঝালর সব গড়ে উঠ্‌ছে; কলালক্ষ্মী আজ যেন তাঁর সমস্ত নৈপুণ্য এই আনন্দ-প্রতিমাদের হাতে ঢেলে-দিয়েছেন।

পুরুষোত্তমদেবের সভায় নেপালরাজ্য থেকে এক শিল্পী তরুণ বয়সে এসে উদিত হয়েছিলেন।

পাষাণে প্রাণের উচ্ছ্বাস ফুটিয়ে তোলাতেই তাঁর বিশেষ আনন্দ ছিল ; কিন্তু তাই বলে নক্সা-কাটা, ছবি আঁকা, কি রঙের খেলা খেলানোতে যে তাঁর হাতযশ ছিল না, তা বলা যায় না। সেই শিল্পী বীরভদ্র যেদিন প্রথম এই রাজসভায় দেখা দিয়াছিলেন তখন তাঁর সঙ্গের সামান্য সরঞ্জামের মধ্যে একটি জিনিস ছিল, যাকে শিল্পীর কোন আনুষঙ্গিক জিনিস বলা চলে না, অধিকন্তু উপদ্রব বলা যেতে পারে। বীরভদ্রের কোলে ছিল একটি মাতৃহারা ছ মাসের কচি মেয়ে। এই মেয়েটিকে তার তরুণ পিতা শিল্পলক্ষ্মীর চেয়ে কিছু কম ভাল বাস্‌তেন না। জগতে ওই দুটিতেই তাঁর সমস্ত আনন্দ নিবিড় হয়ে ছিল। ওই দুটিকে এক করে দেখ্‌বার জন্যে বোধ হয় তিনি তুলির ক্ষুদ্র লিখনের মত এই আনন্দ-কণাটির নাম রেখেছিলেন চিত্রলেখা। তবে চিত্রা নামেই সে পরিচিত। রাজসভায় আসন পেয়ে বীরভদ্র তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে চিত্রকলা ও চিত্রলেখার সেবায় লেগে গেলেন। বাহিরে রাজসভায় তাঁর যশগৌরব তাঁকে নিত্যই নূতন আনন্দ পরিবেষণ কর্‌তে লাগ্‌ল, ঘরে তাঁর চিত্রলেখা

লোকের চোখের আড়ালে দিনে-দিনে চন্দ্রলেখার মত উজ্জ্বল হয়ে পিতার প্রাণ আনন্দময় করে তুল্‌ত।

বীরভদ্রের একান্ত ইচ্ছা ছিল, চিত্রা তাঁর মত শিল্পরসের অনুরক্ত হয়। সকল শিষ্যের চেয়ে যত্নে প্রাণের আগ্রহ দিয়ে তিনি চিত্রাকে শিক্ষা দিতেন। কিশোরী চিত্রার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখে রাজসভা স্তব্ধ হয়ে থাক্‌ত। শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা যখন বালিকা চিত্রার প্রশংসায় রাজসভা মুখরিত করে তুল্‌তেন, তখন তরুণ শিল্পীদের প্রশংসমান চোখ বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে তার প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে স্থির তারকার মত চেয়ে থাক্‌ত, আর গর্ব্বে বীরভদ্রের মুখ রক্ত-পদ্মের মত রাঙা হয়ে উঠ্‌ত। চিত্রার কিন্তু নিজের এ নৈপুণ্য দেখাবার বড় আগ্রহ ছিল না, সে চাইত নিভৃতে নিজের ঘরের নিরালা কোণে বসে মনের বিচিত্র কল্পনারাজি রেখা ও রঙের যোগে প্রাণময় করে তোলে আর তার সৌন্দর্য্যে আপনি বিভোর হয়ে থাকে; কিন্তু তার পিতার সকল আনন্দ, সকল গর্ব্বের আধার যে শুধু সে-ই; তাই তাঁর আনন্দের একটি কণাও পাছে খসে পড়ে, এই ভয়ে সে সর্ব্বদা

তাঁর মন জুগিয়েই চল্‌ত। কিন্তু যতটুকু দর্‌কার তার বেশী বড় কেউ তাকে কর্‌তে দেখেনি। তার কথাও বড় বেশী কেউ শোনেনি। তার গলার স্বর বীণার ঝঙ্কারের মত মধুর কি জলকল্লোলের মত গম্ভীর তা' তার মুগ্ধ পূজারীর দল জান্‌ত না। হৃদয় তার পাষাণের মতন কঠিন কি কুসুমের মতন কোমল তার পরিচয় এক প্রৌঢ় বীরভদ্র ছাড়া বড় কেউ জান্‌ত না। তবে তার উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টির আড়ালে কেমন যেন সর্ব্বগ্রাসী অগ্নির মতন একটা প্রদীপ্ত ভাব সকলের চোখেই পড়্‌ত।

কোজাগর পূর্ণিমার উৎসবের দিনে তরুণীদের ফুলের মেলায় চিত্রার আসন ছিল সকলের আগে। তার আঁকা নক্সা, তার গাঁথা মালা দেখেই সকলে সেদিন উৎসব-সজ্জা শোভন কর্‌তে নেমেছিল। চিত্রা নিজের হাতে তৈরী কর্‌ছিল একটি ফুলের দোলা। দোলার আসনে আর দুই' পাশের বাঁধনে গুচ্ছ-গুচ্ছ ফুল বিচিত্র ভঙ্গীতে মাথা হেলিয়ে রূপের পশরা খুলে দুল্‌ছিল। প্রতি বৎসর শারদ পূর্ণিমায় রাজকুমার বিক্রমদেব নিজের হাতে এই দোলা নদীর ধারের ঘন নিমগাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতেন। এ

কাজে চিত্রাই তাঁর সহায়। আর-সব ফুলের খেলায় চিত্রা কেবল সঙ্গীদের উপদেশ দিয়ে দিত; এ কাজটায় কিন্তু সে আর কাউকে হাত দিতেও দিত না। যশগৌরবের জন্য তাকে কেউ কোনো দিন লালায়িত হতে দেখেনি; তার হাতের কাজ সুন্দর কি অসুন্দর এ বিষয়ে কোনো কথা শুন্‌তে এতটুকু আগ্রহও সে কখনও দেখায়নি। কিন্তু সমস্ত বৎসরের মধ্যে এই একটি দিন সে যে প্রাণভরা আগ্রহ দিয়ে কাজ কর্‌ত, সে তার শিল্পদেবতার তুষ্টির জন্য নয়, নিজের সৌন্দর্য্যতৃপ্তির জন্য নয়, সে শুধু্‌ গর্ব্বভরা মুখে একজনের অতি নিকটে দাঁড়িয়ে তার হাতে হাতে এই শিল্পরচনাটিকে তুলে দেবার জন্য, আর প্রতিদানে একবার তার প্রশংসমান হাসিভরা দৃষ্টিলাভের জন্য। সারা বৎসর চিত্রা তার প্রিয়কে স্বর্গের দেবতার মত দূর থেকেই প্রণাম করে। কেবল বৎসরান্তে একটি দিনের মত এই দেবতা মর্ত্ত্যের পূজারিণীকে তাঁর প্রসন্ন হাস্যে ধন্য করে দিয়ে যেতেন। এই নিমেষের দানে তিনি যা দিয়ে যেতেন তাই ছিল চিত্রার সারা বছরের খোরাক্‌।

বর্ষার-জলভারে ভৈরবী নদীর দু কূল ছাপিয়ে-

উঠেছিল, শরৎকালেও তার উচ্ছ্বাস কমেনি। পূর্ণিমায় নদীর জল যখন ফুলে-ফুলে দুলে-দুলে উঠ্‌ছিল, আর চাঁদের আলো ঢেউয়ের মাথায় আছ্‌ড়ে পড়ে হীরার কণার মত হাজার টুক্‌রো হয়ে ছড়িয়ে পড়্‌ছিল, ঠিক সেই সময়ে নদীর বাঁকের কাছের সেই ঝাঁকড়া-মাথা ঘন নিমগাছটার তলায় মহা ভিড়। এ-রাজ্যে আজ কত বছর ধরে যে ওই বুড়ো নিমগাছটার তলায় তরুণী কুমারীদের নূপুর প্রতি শরতে মধুর নিক্কণ তুলে আস্‌ছে, আর কত রাজকুমার তার ওই প্রকাণ্ড হেলানো ডালটায় ফুলের দোলা টাঙিয়ে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠাকে লক্ষ্মীর সম্মান দিয়ে দোল দিয়েছেন, তার হিসাব বোধহয় এক ওই বুড়ো নিমগাছটাই রাখে। তাকে ঘিরে তরুণ প্রাণের এ আনন্দ-উৎসব তার যৌবনকাল থেকেই হয়ত চলে আস্‌ছে, তাই তাদের স্পর্শে আজও সে প্রতিবৎসরে নব যৌবনের সঞ্চারে বৃদ্ধ বয়সেও পুলকিত হয়ে ওঠে। হিন্দোলের দোলাও বর্ষায়-বর্ষায় তারি শাখায় আনন্দে দোল দেয়। যাকে ঘিরে চিরচঞ্চলদের চপলতা চলেই আস্‌ছে, সে স্থবির হয় কি করে?

কুমার বিক্রম যখন তাঁর বলিষ্ঠ বাহুর সমস্ত জোর দিয়ে দোলার দড়িটা গাছের ডালের দিকে ছুঁড়ে দিলেন, দোলার ফুল-সাজটা তখন চিত্রার হাতে। চিত্রা তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। দড়িটা ঘুরে নেমে আস্‌তেই তার ছুটো মুখ সমান কর্‌বার জন্য বিক্রম সজোরে এক টান দিলেন। কি জানি কেন আজ এ-আনন্দের আঘাত বুড়ো নিমটার সইল না। তার এত কালের বাঁকা ডালটা আজই মড়্‌মড়িয়ে ভেঙে গেল। নদীর বাঁকের ঢেউয়ের ঘা খেয়ে-খেয়ে সেখানে গাছের পাশে জমি খুব কমই ছিল। রাজকুমার নিজের টানের জোর সাম্‌লাতে না পেরে ডালটা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে নদীর গর্ভেই পড়্‌লেন। প্রকাণ্ড ডালটা ঠিক তাঁর মাথার উপরে এসে পড়্‌ল। কালো-জলের মধ্যে সব যেন মিশে অন্ধকার হয়ে গেল। গাছতলার ওই ভিড়ের মধ্যে আর দ্বিতীয় পুরুষ নেই। কুমারকে তোলে কে? ওই প্রচণ্ড আঘাতের পর নিজে ওঠ্‌বার ক্ষমতাও তাঁর নেই। কিশোরী কুমারীদের কলকণ্ঠের কোলাহলই বা তখন শোনে কে? তাঁদের ক্ষীণ বাহুতেও এত শক্তি নেই যে বিক্রমের বিশাল শরীর

টেনে তোলেন। চিত্রা কিন্তু এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার দীর্ঘ দেহে বলের অভাব ছিল না, সুপুষ্ট বাহুতেও শক্তি যথেষ্ট। পাহাড়ী মেয়ের রক্তের জোর তার শরীরে আজও ছিল। ডালপালা ঠেলে দুই হাতে জল কেটে সে চারদিকে বেড় দিয়ে একবার দেখে নিলে। তারপর যখন একডুব দিয়ে সে উঠে এল, তখন গাছের ডালের ছড় লেগে তার হাত পা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, কঠিন পরিশ্রমে মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙা, সাধের উৎসব-সজ্জা ছিন্ন ভিন্ন বিবর্ণ, কিন্তু দৃঢ় মুষ্টিতে তখন সে কুমারের অবশ দেহ ধরে আছে।

(২)

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছে। রাজপুরীর ঘরে-ঘরে দাসীরা প্রদীপ জেলে দিয়ে গেল। সন্ধ্যাবন্দনার শঙ্খ আজ ভয়ে-ভয়ে বাজ্‌ছে। রাজকুমার আজ দশদিন পীড়িত, তাই দাসদাসী সকলের কাজকর্ম্ম চলাফেরা কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

হাতীর দাঁতের উপর সোনার পাতের নক্সাকাটা

উঁচু পালঙ্কে ধপ্‌ধপে শাদা বিছানায় রাজকুমার শুয়ে আছেন। মাথার কাছের খোলা জান্‌লা দিয়ে মন্দ সমীরণ শিউলির গন্ধে ঘর মাতিয়ে তুল্‌ছে। চিত্রা সেই ঘরে রাজকুমারের সেবায় ব্যস্ত। হাতে ছোট একটি সোনার বাটিতে চন্দন, চিত্রা থেকে-থেকে বিক্রমের কপালে চন্দনের প্রলেপ দিচ্ছে। তার দুটি হাতই কাজে নিযুক্ত; হাতে জড়ানো এলোচুলের খোঁপা খসে পড়্‌ছে। চিত্রা হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মাঝে-মাঝে চুলগুলো ঠেলে দিচ্ছে, কিন্তু তাদের সংযত করতে পার্‌ছে না। তার বাসন্তী রঙের শাড়ীর আঁচলখানা উড়ে-উড়ে রাজকুমারের গায়ে এসে পড়্‌ছিল, আবার আপনি সরে যাচ্ছিল।

চিত্রা দেখ্‌ছিল, আজ সকাল থেকেই বিক্রমের মুখে মাঝে-মাঝে চেতনার ভাব ফুটে উঠ্‌ছে। তার আশা হচ্ছিল, আজ তার সেবা, তার প্রতীক্ষা, সবই ধন্য হবে। আনন্দে তার সে আগুনের মত দৃষ্টিও আজ কোমল হয়ে এসেছে। তার চোখ টল্‌টল কর্‌ছিল, পাছে কুমারের মুখে তার চোখের জল পড়ে তাই বার বার মুখখানা ঘুরিয়ে সে জান্‌লার বাইরে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল। প্রশস্ত নীল

আকাশ তখন শূন্য, এক কোণে কেবল একটি তারা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ছিল। ক্রমে উপরের মেঘ নেমে নেমে তারাটিকে তার কালো কোলের নিবিড় আঁধারের মধ্যে লুকিয়ে নিলে। শূন্য গগনের একটি তারার মত একটি আশার শিখা চিত্রার শূন্য মনে ঊর্দ্ধমুখী হয়ে জ্বল্‌ছিল, কিন্তু মেঘের ভয় সে কাটাতে পারেনি। শরৎকালের ফুলে-ভরা শিউলির ডাল যেমন একটু নাড়া পেলেই সব কটি ফুল উজাড় করে গাছতলায় ঢেলে দেয়, চিত্রার হৃদয়ও তেমনি উন্মুখ হয়ে ছিল, একটু নাড়া পেলে সে আজ তার পূর্ণডালি বিক্রমের চরণে শূন্য করে সঁপে দিয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে স্নেহের পরশ না পায়?

ধীরে কুমারের চোখ খুলে এল। চন্দনপাত্র নামিয়ে রেখে, এলোচুল জড়িয়ে নিয়ে, চিত্রা তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। বিক্রমের দৃষ্টি তখনও অর্থশূন্য। কোনো মানুষ কি জিনিসের ছায়া তাঁর চোখে যে পড়েছিল এমন মনে হয় না; চিত্রা দীনা ভিখারিণীর মত তাঁর মুখের বাণীর কাঙাল হয়ে সেই সুন্দর পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

মেঘে যখন আকাশ ঢেকে গেছে, ঘরের সোনার প্রদীপ জালিকাটা ঢাকার আড়াল থেকে 'আলোর ফোঁটা ছড়াচ্ছে, এমন সময় কুমার একটু সরে এসে বল্‌লেন, "কে তুমি, মালতী না বিজয়া? কথা কও না যে? আমি এ কোথায় রয়েছি?"

চিত্রা অতি ধীরে উত্তর দিল, "আমি চিত্রা।"

বিক্রম একটু বিস্মিত হয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বল্‌লেন, "চিত্রা বলে' কোনো দাসীকে ত মনে পড়্‌ছে না! শিল্পী বীরভদ্রের কন্যা এক চিত্রা আছে বটে!"

চিত্রা মুখখানা রাঙা করে বল্‌লে, "আমিই সেই চিত্রা।"

"তুমি এখানে কেন? আমি কি তোমাদের বাড়ী রয়েছি না কি? আশ্চর্য্য ত!"

"আপনি ভৈরবীর জলে পড়ে গিয়েছিলেন, পূর্ণিমার উৎসবে' দোলা টাঙাচ্ছিলেন মনে নেই? সেখানে আর লোকজন পাওয়া গেল না, তাই আমিই আপনাকে জল থেকে তুল্‌তে......"

বিক্রমের মুখে কিসের যেন একটা ছায়া খেলে গেল, "বুঝেছি", বলে তিনি চুপ করে রইলেন।

চিত্রা রূপার বাটিতে করে সুগন্ধি সরবৎ কুমারের মুখের কাছে এনে ধর্‌ল। কুমার পান করে আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে চিত্রার মনে হচ্ছিল, আনন্দের আভায় পাণ্ডুর মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এতটুকু প্রদীপের আলোতে যেমন প্রকাণ্ড ঘরের সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে যায়, ওইটুকু আনন্দের দীপ্তি দেখে চিত্রার নিরাশ মনও তেমনি আশায় ছাপিয়ে উঠেছিল। স্বর্গের দেবতা আজ তার পূজায় প্রসন্ন হয়েছেন, আর তার চাইবার কি আছে, ভাব্‌বারই বা কি আছে? সমস্ত ভবিষ্যৎ আজ আনন্দময়; আর সে দীনা ভিখারিণী নয়, শ্রেষ্ঠা পূজারিণী। দেবতার বর এখনি সহস্র ধারায় ঝরে পড়্‌বে; তার ক্ষুদ্র হৃদয়পাত্রে এত দান সে কোথায় রাখ্‌বে?

রাজকুমার ঘণ্টা দুই পরে আবার চোখ মেলে বল্‌লেন, "চিত্রা শোন, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আজ আমার অনেক কথা বল্‌বার আছে। তুমি শুন্‌বে কি?"

চিত্রা মুগ্ধ দৃষ্টিতে কুমারের মুখের দিকে চেয়ে সরে এসে তাঁর পায়ের কাছে বস্‌ল। আনন্দে তার

মুখ দিয়ে কথা সর্‌ছিল না। বিক্রমদেব বল্‌লেন, “জানো চিত্রা, আজ কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে আমি কি পেয়েছি? আমি স্বপ্নে দেখ্‌লাম, কোজাগরের লক্ষ্মী আমার জাগরণ সার্থক করেছেন, তিনি মুক্ত কেশে স্বর্ণভাণ্ড হাতে আমারি শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছেন, ধানের শীষ যেমন মৃদু বাতাসের ঘায়ে দুলে-দুলে ওঠে, তাঁর স্বর্ণাঞ্চল তেম্‌নি দুলে-দুলে আমার অঙ্গ স্পর্শ করে গেল। তাঁর চির-উজ্জ্বল দীপ্তি জোৎস্না-রাত্রের গগনভরা আলোর তলায় আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। তিনি নত হয়ে আমার ম্লান ললাটে নিজ হাতে জয়টীকা এঁকে দিয়ে গেলেন। সে পুণ্যকরস্পর্শে আমার আঁধার জগৎ শত সূর্য্যের আলোয় আলো হয়ে উঠ্‌ল।”

শুন্‌তে শুন্‌তে চিত্রার প্রাণ পুলকে নেচে উঠ্‌ছিল; সে ভাবছিল সে লক্ষ্মী কে? এখনি শুন্‌বে, আর দেরী নেই।

বিক্রম আবার বল্‌লেন, “ক্লান্ত মুদিত নয়ন মেলে কি দেখ্‌লাম জানো?”

চিত্রা উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ল। বিক্রম বল্‌লেন, “দেখ্‌লাম আমার সে লক্ষ্মী আর নেই; চারিদিকে

শুধু শূন্য। কিন্তু আজ পূর্ণিমার দিনে আমার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে একটি বাণী বাজ্‌ছে 'লক্ষ্মী লাভ হবে, লক্ষ্মী লাভ হবে।' কিশোর বয়স হতে যে-রূপমাধুরী ধ্যান করে এসেছি, সে আমার কল্পনারই সৃজন, কল্পলোকেই সে সুন্দরীর বাস। আজ তাকে প্রত্যক্ষ দেখেছি; আমার এ স্বপ্ন ত প্রত্যক্ষ দেখাই। আজ আমার সাধনা পূর্ণ হয়েছে; সিদ্ধি, আমারি সে মানসীর হাতে; আমি তা লাভ করবই। জ্যোতিষী গোপালভট্ট আমায় আজ সাত বৎসর ধরে বলে আস্‌ছেন,—লক্ষ্মী প্রসন্ন হলে স্বপ্নে তোমায় স্বহস্তে টীকা দিয়ে যাবেন। সেই দিন থেকে এক বৎসরের মধ্যে তুমি তোমার মানসী সুন্দরীকে লাভ কর্‌বে। ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার সে বাণী আজ সার্থক হয়েছে। তাই আনন্দে আমি অধীর হয়ে উঠেছি। এ পৃথিবীতে আমার চক্ষে আর কোনো দুঃখ কোনো দৈন্য নেই। সব আজ মধুময়। কার কি দুঃখ আছে বল; আমি মুক্তহস্ত; সর্ব্বস্ব দিয়ে সকলের অভাব মোচন করে দেবো। আমি যেদিকে তাকাব সেই দিকেই আনন্দ-উৎসব দেখ্‌তে চাই। তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা সকলের

চেয়ে বেশী। বল কি চাও, রাজভাণ্ডার লুটিয়ে আমি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করব, তোমার কোনো খেদ রাখ্‌ব না। ধন, জন, মান, যশ, কি চাও বল? কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে তোমার চির-অনুচর করে দেবো বল? তোমা হতেই আমার সব, তুমি কিসে তুষ্ট হবে তাই বল।"

চিত্রা যে কি চায়, এর পরে তা আর সে কি করে বলে? যে তারি হাতে সব পেয়েছে বলে নিজ মুখে স্বীকার কর্‌ছে, তার এ পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে চিত্রার সব আনন্দ আঁধারে তলিয়ে গেছে। তার আশার আলো এ আনন্দের ঝোড়ো হাওয়ার বেগ সাম্‌লাতে না পেরে প্রথম ফুৎকারেই নিবে গেছে। এ ঘোর অন্ধকারে আলো আর কেউ জ্বালাবে না। চির অন্ধের মত এইখানেই তাকে হাত্‌ড়ে বেড়াতে হবে; যদি কোনো দিন প্রদীপে হাত ঠেকে যায়, যদি কোনো দিন আর-কারো আলোক-শিখায় ঠেকিয়ে তার আলোটিও জ্বালিয়ে নিতে পারে। জগৎটা আশ্চর্য্য বটে! যে দুটি মানুষের জীবন-সূত্র এমন করে জড়িয়ে আস্‌ছিল, যাদের একজনের সুখ-দুঃখই আর-একজন অম্লান বদনে নিজের সুখদুঃখ

করে নেবে বলে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে ছিল, কোথাকার কি একটা সামান্য আঘাতে দেখা গেল তারা দুজনে যেন বিপরীত গতিতে ঘুরে চলে গেল। বিক্রমের জগৎ আজ আনন্দময় বলেই ত চিত্রার জগৎ চির-অন্ধকার।

চিত্রা কিছুক্ষণ পরে উত্তর দিলে, "আমি দরিদ্র শিল্পীর কন্যা, রাজ-ভাণ্ডারে আমার আর চাইবার কি আছে? আপনার সেবা করবার সুযোগ আর অধিকার পেয়েই আমি ধন্য। আর কিছু আমি চাই না। শুধু আশীর্ব্বাদ করবেন যেন আমার এত দিনের শিল্পশিক্ষা সার্থক হয়। আমি যা চাই, তার হাতেই তা পাব।"

কুমার বললেন, "তোমার শক্তি অক্ষয় হোক। শিল্পের অপূর্ব্ব সৃষ্টি যেন তোমারি হাতে গড়ে ওঠে।"

চিত্রা নীরবে রাজকুমারকে প্রণাম করে সরে দাঁড়াল।

(৩)

প্রায় এক বৎসর ধরে রাজকুমার বিক্রম তাঁর মানসীর সন্ধানে ফিরছেন। দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে

কুমারের অনুচর আর দূতদের পা ক্ষয়ে যাবার জো হয়েছে। বেচারা জ্যোতিষী গোপালভট্ট ত খড়ি পেতে পেতে হাতে কড়া পড়িয়ে ফেলেছেন। আর স্বয়ং কুমার ত আজ এক বৎসর ধরে লক্ষ্মীর আশায় নিশিপালন কর্‌ছেন। নিদ্রাদেবীর সঙ্গে যে সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর সতীন সম্পর্ক তা বোধ হয় ইতি-পূর্ব্বে কেউ কোনো দিন মনে করেনি। বিক্রমের ঘরে লক্ষ্মীস্বরূপাদের অজস্র চিত্র গড়াগড়ি যাচ্ছে। তাঁদের এ অনাদর স্বচক্ষে দেখ্‌লে বিক্রমকে যে তাঁরা কত বড় অভিসম্পাত কর্‌তেন তা বলা যায় না।

চিত্রা এখন আর কুমারের দর্শনের আশায় ফেরে না। বিমুখ দেবতাকে প্রসন্ন কর্‌বার ব্যর্থ চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে সে বোধ হয় এখন কলালক্ষ্মীর সেবাতেই তার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত সম্পদ ঢেলে দিয়েছে। গুটিপোকা যেমন অন্ধকার কোটরের মত গুটির মধ্যে বন্দী হয়ে বসে একদিন প্রজাপতির বেশে অজস্র সৌন্দর্য্য নিয়ে আলোর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, চিত্রাও তেম্‌নি করে তার নির্জ্জন কুটীরের কোণে বসে সৃষ্টি-রচনায় মগ্ন হয়ে দিন

কাটাচ্ছে, কি গোপনে তার পুরাতন প্রিয়ের উদ্দেশ্যে অশ্রুজলের নৈবেদ্য সাজাচ্ছে তা কে জানে ?

তখন বর্ষাকাল। রাজপ্রাসাদের বাঘমুখো নল দিয়ে ছাদের জল সারাদিনরাতই গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে। বাঁধানো সানের উপর নলের জল পড়ে খই ফোটার মত ছট্-ছট্ শব্দে চারিদিক ধ্বনিত করে তুল্‌ছে। বাদল দিনে রাজকুমারের এ দীর্ঘ প্রতীক্ষা অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিনি কোলের কাছে সাতরাজ্যের রাজকন্যা মন্ত্রীকন্যাদের ছবি জড়ো করে মেঘলা আকাশের গুরু গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে ভাব্‌ছেন,—জ্যোতিষীর বাক্য বুঝি বৃথা হয়ে গেল ; কই আজও ত সে লক্ষ্মীস্বরূপার সন্ধান পেলাম না। মিথ্যা, সবি মিথ্যা। সে স্বপ্ন, স্বপ্নের মতই ফাঁকা। এ ছলনায় ভুলে থাকা পুরুষের পক্ষে শোভা পায় না।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাত অনেক হয়ে গেল। কুমারের অজ্ঞাতে কখন্ বৃষ্টিধারার উন্মত্ত নৃত্য থেমে গেছে ; মেঘের ঘোমটা ঠেলে কৃষ্ণপক্ষের বাঁকা চাঁদ বৃষ্টির জলে নিজের মুখের বিকৃতি দেখে হেসে কুটিকুটি হচ্ছেন। বিক্রমের মনে হল দূরে

কোথায় যেন কে বীণার ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল ; বর্ষার বিরহ-গাথা বীণার তারে তারে গভীর স্থরে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। সে বিরহ-গাথায় কত গোপন-দুঃখের অশ্রু যেন স্থর ধরে ফুটে উঠ্‌ছে। কুমার ভেবেই পেলেন না, এমন গভীর রাত্রে কে বীণার তারে তার প্রাণের কথা গেয়ে গেল। দিনের আলো কি তার গানে কান দিত না ? তাই স্তব্ধ উৎকর্ণ রাত্রির দরবারে এমন অপূর্ব্ব সঙ্গীত স্থষ্টি ?

শেষরাত্রের রঙীন নেশা কাট্‌তে-না-কাট্‌তেই বীণা থেমে গেল। ভোরের বেলা কুমারের দূত অনেক খোঁজ করেও কিছু খবর দিতে পার্‌লে না। সেদিন রাত্রেও আবার বাঁশীর মন-ভুলানো স্থর কাকে যেন ডেকে-ডেকে প্রাসাদের চারিদিকে ঘুরে ক্রমে ক্রমে দূরে অতিদূরে সরে গিয়ে বনের ধারে মিলিয়ে গেল। তারপর আবার সেই বীণার ঝঙ্কার। পাঁচ দিন সাতদিন এম্‌নি ভাবেই চল্‌ল। কুমার বল্‌লেন, আস্‌ছে রাত থেকেই এর খোঁজ নিতে হবে।

একদিন দূত এসে খবর দিলে, পুরানো শিব-মন্দিরের পিছনে শালবনের গায়ের কাছে মহা-

রাজের প্রপিতামহ যে বিদেশিনী ভুবনমোহিনী রাজকন্যার জন্যে গোলকধাঁধার মত বাড়ী করেছিলেন, সেই বাড়ীর ঘরে-ঘরে, বন্দিনী কুমারীর জীবিতকালের মত আবার আলোর মালা ফুটে উঠেছে। সেখানে না জানি আবার কোন্ সুর-সুন্দরীর আবির্ভাব হয়েছে, যে-সে লোকে যে সেখানে প্রাণ ধরে ঢুক্‌বে তা ত মনে হয় না। ঘরে কি শুধু কেবল আলোর ছটা?—ধূপের গন্ধে শালবন ভরে উঠেছে। আর ফুলের সুবাস ত কোণে-কোণে। মানুষ কিন্তু বড় দেখা যায় না। তবে অলঙ্কারের মৃদু ঝঙ্কার যেন এক-একদিন কানে আসে বলে মনে হয়। নূপুর-পায়ে মাঝে-মাঝে কে যেন চঞ্চল চরণে ঘুরে বেড়ায়। তার হাতের কাঁকণও যেন মাঝে-মাঝে অধীর হয়ে বেজে ওঠে। কিন্তু সারাদিনরাতের মধ্যে এই ক্ষণিক সাড়াগুলি এত অল্প মেলে যে কেউ আছে কি না তা ঠিক করে বলা শক্ত।

কুমার বল্‌লেন, "আমি দেখ্‌ব কিসের এ মায়াজাল।"

দূত বল্‌লে, "দিনের বেলা কিন্তু বাড়ীর চারিদিক

বন্ধ থাকে, ঠিক যেন সেই পুরাকালের কারাগার দুঃখিনী রাজ-কন্যার কঠিন কারাবাসের কথা মৌন মুখে আজও জানিয়ে দিচ্ছে। রাত্রি না হলে সে অপ্সরার নিকেতনের আভা মিল্‌বে না।"

কুমার তাইতেই রাজি।

মাঝরাত্রি অনেকক্ষণ উৎরে গেছে। দূরে শালবনের পাশে সেই পোড়ো বাড়ীটার মধ্যে আজও বীণা বেজে উঠ্‌ল। কুমার পথে বেরিয়ে পড়্‌লেন। বুড়ো নিমগাছটার আড়াল থেকে চাঁদের আলো পথের মাঝে আলোর ডোরা কেটে দিচ্ছিল। সেই ঝাপ্‌সা আলোয় কষ্টে পথ দেখে কুমার বিক্রম বন্দিনী রাজকন্যার বাড়ীর পাশে এসে পৌঁছ-লেন। এ-পথে কতকাল যে লোক চলেনি তার ঠিকানা নেই। কুমার বীণার শব্দ লক্ষ্য করে অপথ কুপথ দিয়ে কোনো-রকমে সেই বীণাবাদিনীর জান্‌লার তলাতেই এসে পড়েছিলেন। শত বৎসর ধরে শীতের আগমনে গাছের পাতা ঝরে-ঝরে সেখানে পৃথিবীর শ্যাম-অঙ্গ একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। একে ত রাজার ছেলে, অন্ধকারে পথচলা কোনো কালেই অভ্যাস নেই, তার উপরে ঝরা

পাতার স্তূপে হঠাৎ এসে পা দেওয়া। শুক্‌নো পাতা আর ডালপালার মড় মড় শব্দে সুরমুগ্ধার সুরের নেশা টুটে গেল বোধ হয়। হঠাৎ দেখা গেল একরাশ খোলা চুল আর একখানা সোনালি আঁচল দুলিয়ে কে, যেন এসে জান্‌লাটা টেনে বন্ধ করে দিলে। তাঁর মুখ দেখা গেল না, দেখা গেল শুধু হীরার কঙ্কণ-পরা একখানা গৌর হাত। ঘরের প্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় হীরার কাঁকণ ঝল্‌সে উঠ্‌ল। জানালা বন্ধ হয়ে যেতেই ভাঙা প্রাসাদ আবার তেমনি চিরকালের মত অন্ধকার। আশায়-আশায় অপেক্ষা কর্‌তে কর্‌তেই কাক কোকিল জগৎকে জাগরণের বার্ত্তা জানিয়ে দিলে। অগত্যা কুমারকে রুদ্ধ দরজার বাহির থেকেই ফির্‌তে হল।

পরদিন প্রায় ভোর রাত্রে আবার বনের বীণার তারে বিচিত্র রাগিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল। সে-সুরের টানে কুমার আপনি পথে এসে নাম্‌লেন। আজ কিন্তু জান্‌লার পাশে এসে দাঁড়াতে বীণার সুর ভঙ্গ হল না। বীণাবাদিনী সুরের মোহে মুগ্ধ হয়ে আপন মনে ঝঙ্কার দিয়েই চলেছেন। খোলা জান্‌লার উল্টাদিকে দেয়ালের গায়ে ডানা মেলে

রূপার পরী উড়্তে-উড়্তে শিকলে বাঁধা পড়ে আছে। তার দুই হাতে দুটা আর মাথায় একটা সোনার প্রদীপ। তিনটি প্রদীপের আলোই সুন্দরীর মুখে এসে পড়েছে। তিনি পাশ ফিরে বসে আছেন। কোলের উপর বীণা নিয়ে মুখ নীচু করে বাজিয়ে চলেছেন। শুধু আধখানা মুখ দেখা যাচ্ছে। সুন্দরীর মুখের রঙে প্রদীপের আলো যেন লজ্জায় ম্লান। ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের মাঝখানে সোনার পদ্মের মত মুখখানি দেখে কুমারের ইচ্ছা কর্‌ছিল ছুটে গিয়ে তার মুখখানা সোজা করে ধরে একবার দেখেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছানো তাঁর সাধ্যের বাইরে। কুমার দুই পায়ে ডালপালার উপর চাপ দিয়ে খড়-খড় শব্দ করে বীণার বাজ্‌নায় ব্যাঘাত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন। আজ কিন্তু বীণা থাম্‌ল না, সুন্দরী নিমেষের জন্যও চোখ তুলে তাকালেন না। আর একদণ্ড কাট্‌তে না কাট্‌তেই সূর্য্যের প্রথম রশ্মি ফুটে উঠ্‌ল। অমনি ঘরের আলো কার আঁচলের ঘায়ে নিবে গেল। বীণাও তখন নীরব হল। কুমারের মনে হল অন্ধকারে তাঁর মনোমোহিনী উঠে দাঁড়িয়ে জানালা বন্ধ করে দিলেন। তরুণীর

ক্ষীণ দীর্ঘ তনু ছায়ার মত দেখা গেল, মুখ অন্ধকারে অস্পষ্ট। আজ প্রাসাদ থেকে আস্‌বার সময় কুমার একখানা লিপি লিখে এনেছিলেন, "অয়ি অপরিচিতা, নিমেষের তরে' আমি তোমার দর্শনভিখারী। মুগ্ধ ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ কর্‌বে কি ?" জান্‌লার কাছে লিপিখানা রেখে কুমার সেদিনও বাড়ী ফির্‌লেন।

তৃতীয় দিন যখন কুমার তাঁর' তীর্থস্থলে এসে উপস্থিত, তখন জান্‌লা বন্ধ। তাঁর পায়ের শব্দেই সশব্দে জান্‌লা খুলে গেল। কুমার মুখ তুলে চেয়ে দেখেন কপাটের গায়ে একখানা হাত রেখে হাসিভরা মুখে উজ্জ্বল চোখ মেলে সেই অনিন্দিতা সুন্দরী দাঁড়িয়ে। অসংখ্য রত্ন-অলঙ্কারে তাঁর দেহ সুসজ্জিত। অমন ভুবনমোহন রূপ কুমারের চোখে ত কোনো দিন পড়েই নি, স্বপ্নে তিনি যে সুরসুন্দরীকে দেখেছিলেন, তার রূপও এর কাছে অতি ম্লান। কিন্তু এ কি হল ? কুমার নির্ব্বুদ্ধির মত নিমেষের দেখা চেয়েছিলেন বলেই কি চোখের পলক পড়্‌তে না পড়্‌তে তাঁর তৃষিত দৃষ্টিকে অবহেলা করে সুন্দরীর ঘরের জান্‌লা বন্ধ হয়ে

গেল ! ব্যথিতচিত্তে কুমার সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। উপর থেকে ছবির মত সুন্দর একখানা লিপি তাঁর উষ্ণীষে এসে পড়্‌ল ; চেয়ে দেখ্‌লেন হীরার কঙ্কণ-পরা সেই বিদ্যুৎবরণীর হাতখানা জান্‌লার এতটুকু ফাঁকের মধ্যে, মিলিয়ে গেল। লিপিখানায় লেখা ছিল, "তৃপ্ত হয়েছ কি ? আর কি চাই ?" কুমার ডেকে বল্‌লেন, "তোমার দর্শন-সুখ চাই।" সেদিন কিন্তু তাঁর আশা মিট্‌ল না।

পরের রাত্রে বর্ষার বারিধারা অবিশ্রাম ঝর্‌ছিল। কুমার সেই দুর্য্যোগে পথহারা পথিকের মত ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে সুন্দরীর দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। দেখ্‌লেন একখানা উঁচু পালঙ্কের উপর জান্‌লার দিকে মুখ করে নিদ্রিতা সেই ভুবনমোহিনী। কালো চুল রেশমের গোছার মত পালঙ্কের গা দিয়ে লুটিয়ে পড়েছে। হীরার কাঁকণ-পরা হাতখানি বুকের উপর লতার মত লতিয়ে আছে, আর একখানা হাত অলসভাবে মাথার তলায় পড়ে। শিয়রে দাসী পিছন-ফিরে বসে মুক্তার ঝালর-দেওয়া পাখায় মৃদু বাতাস দিচ্ছে। জলের ঝাপ্‌টায় কুমারের চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আস্‌ছে ; তিনি বারবার

চোখ মুছে, সেই স্থির সৌদামিনীর রূপমাধুরী দেখ্‌ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন আকাশ ছেড়ে চাঁদের পাশ থেকে রোহিণী আজ খসে এসে পৃথিবী আলো কর্‌ছেন। ভোর হতেই বৃষ্টি থেমে এল, বীণাবাদিনীর দাসী বাঁ-হাতখানা বাড়িয়ে জান্‌লার কপাট বন্ধ করে দিলে। কুমার আজ তাঁর মনের কথা সোনার অক্ষরে লিখে এনেছিলেন। সেই লিপি জান্‌লায় রেখে চলে গেলেন।

সারাদিনটা কাট্‌লে তবে আবার রাত আস্‌বে, সেই ভাবনায় দিনটা কুমার কিছুতেই কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছিলেন না। সময়ের চঞ্চল পাখায় আজ যেন কেউ হিমাচল পর্ব্বতের ভার ঝুলিয়ে দিয়েছে। গতি আজ তার বড় মন্থর। রাজপ্রাসাদে বন্দীরা আজ যেন এক এক যুগ পরে প্রহর ঘোষণা কর্‌ছে। সন্ধ্যায় বৈতালিকের গান আজ কি আর প্রাণ আনন্দে মাতিয়ে দেবে না? সূর্য্যদেবেরও আজ কি হয়েছে, তাঁর মুখের হাসি কিছুতেই শেষ হয় না, বর্ষার ঘনমেঘও আজ তাঁর মুখে অন্ধকারের আবরণ এনে দেয় না।

যেমন করেই হোক দিন যখন কাট্‌বেই, তখন একরকমে কেটে গেল। প্রাসাদের স্বর্ণচূড়া অস্তমান সূর্য্যের বিদায়চুম্বনে এমন মধুর হাসি বোধ হয় আর কোনো দিন হাসেনি। কুমারের হৃদয়ের প্রতি-তন্ত্রী আজ সে হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রাত্রির আগমনের সঙ্গেই কুমারের বরসজ্জা সুরু হল। রাজভাণ্ডার তোল্‌পাড় করে শ্রেষ্ঠ রত্নহার তিনি নিয়ে এসেছেন, তাঁর প্রেয়সীর কণ্ঠে পরিয়ে দেবার জন্যে। শত সূর্য্যের আলোর মত তার প্রভা। আজ পায়ে হেঁটে তিনি যাবেন না, অশ্বশালা থেকে তুষারের মত শুভ্র বাহন তিনি নিজে বেছে এনেছেন। উষ্ণীষে আজ তাঁর হীরামণি ঝলক দিয়ে উঠ্‌ছে।

শেষরাত্রে যখন পথে বেরোলেন, তখন ভোর হতে বড় বেশী দেরী নেই। কিন্তু চাঁদের আলো নেই বলে আজ চারিদিক কেমন কুয়াসায় ঢাকা। কুয়াসার শীতল স্পর্শ আজ কুমারের কাছে তাঁর প্রেয়সীর হাতের শীতল স্পর্শ বলেই মনে হচ্ছিল। দূর থেকে দেখা গেল জান্‌লার নীচে এতকাল পরে আজ একটা গুপ্ত দরজা হঠাৎ খুলে গেছে; অকালে-

ফোটা পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত সেই দরজার কপাটদুটি তাঁর চোখে সুন্দর হয়ে উঠেছিল।

কুমার দরজার কাছে এসে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ে একেবারে তীরের মত বেগে ভিতরে গিয়ে ঢুক্‌লেন। সাম্‌নেই সেই তন্বী তরুণী ঊষার আলোর মত লাল্‌চে শাড়ীতে সুগঠন দেহখানি বেষ্টন করে লজ্জানত মুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাত দুখানি বুকের কাছে জড়ো করা; হাতে সদ্য-ফোটা ফুলের মালা, তার পাপ্‌ড়ির জল তরুণীর আঁচলে জলের ছোপ ধরিয়ে দিচ্ছে। রূপের নেশায় কুমার তখন পাগল। তরুণী তাঁর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেবার আগেই তিনি ছুটে গিয়ে তার গলায় হীরার হার দুলিয়ে দিলেন। তারপর সে ফুলের মালা তুলে ধর্‌ল কি না, না দেখেই তিনি সেই কুসুম-কোমল হাতদুখানি চেপে ধর্‌তে গেলেন।

কি আশ্চর্য্য! তরুণীর হাত তুষারের মত শীতল পাষাণের মত কঠিন। কুমার বিস্মিত নেত্রে চেয়ে দেখ্‌লেন, তাঁর মনোমোহিনী প্রেয়সী পাষাণী। ঘরের চারিধারে তারি ছাঁদে গড়া অসংখ্য মূর্ত্তি,—

সমাপ্ত, অর্দ্ধসমাপ্ত, অসমাপ্তভাবে ছড়ানো। তারি মুখের ছবি নানারঙে মোহন ভঙ্গীতে আঁকা ঘরের মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। মাঝখানে তপঃক্লিষ্টা সন্ন্যাসিনীর মত চিত্রা বসে। তার একখানা হাতের রঙ তুষারের মত শুভ্র। পাষাণীর মত তারো হাতে হীরার কাঁকণ।
